ফররুখ আহ্‌মদের বৈশিষ্ট্য

সৈয়দ আলী আহসান

ফররুখ আহ্‌মদের বৈশিষ্ট্য
সৈয়দ আলী আহসান
জাতীয় অধ্যাপক, কবি ও সাহিত্য সমালোচক

প্রকাশক
ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে
মুহম্মদ মতিউর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন

©
গ্রন্থকার

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৯

কম্পোজ
মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

মূল্য : ৬০.০০ টাকা

Farrukh Ahmeder Boisista By Syed Ali Ahsan. Published by: Muhammad Matiur Rahman, Founder President, Farrukh Gobeshana Foundation.
Price : 60.00 US$ 2 only.

কবি ফররুখ আহমদ

[জন্ম : ১০ জুন, ১৯১৮ মৃত্যু : ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪]

সূচি

প্রসঙ্গ কথা /০৫

কলকাতায় ফররুখ এবং আমি /১০

ফররু খ সম্পর্কে /১৭

ফররুখ আহ্‌মদের বৈশিষ্ট্য /১৯

ফররুখ আহমদের ‘সাত সাগরের মাঝি’ /২১

ফররুখ আহমদের সিরাজাম মুনীরা /৩৩

ফররুখ আহমদ-এর ‘হাতেম তায়ী’ /৩৭

ফররুখ আহমদের ‘মুহূর্তের কবিতা’ /৪৬

ফররুখ আহমদের ‘দিলরুবা’ /৫০

সৈয়দ আলী আহসান : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি /৫৬

প্রসঙ্গ কথা

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররু খ আহমদ। ভাব-ভাষা-বিষয়-ঐতিহ্যবোধ ও শিল্প-নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। নিঃসন্দেহে তিনি সনাক্তযোগ্য একজন শক্তিমান কবি। কবি হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী, তবে কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত। কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ঘটলেও তিনি প্রধানত কবি। তাঁর কবি-খ্যাতি বিরল, কাব্যকলার বিভিন্ন রূপ-রীতি ও আঙ্গিকেও তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে। গীতিকবিতা, সনেট, গান, শিশুতোষ কাব্য, ব্যঙ্গকবিতা, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, মহাকাব্য ইত্যাদি বিচিত্র রূপ-রীতিতে তাঁর মূল্যবান অবদান রয়েছে।

বিশেষ ভাবাদর্শের কারণে কবি বিরু দ্ধবাদীদের নিকট অনেক সময় সমালোচিত হয়েছেন, কেউ কেউ তাঁকে উপেক্ষা করার বা 'অনতিবড়' কবি বলারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ কখনও তাঁর অসাধারণ কবি-প্রতিভাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করেন নি। বিংশ শতাব্দীর মধ্য-তিরিশে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও চল্লিশ দশকের শুরু থেকে পরবর্তী প্রায় সাড়ে তিন দশক কাল বাংলা কাব্যের মূলধারায় তিনিই ছিলেন সর্বাধিক আলোচিত, সর্বজনগ্রাহ্য এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ঐ সময় জাতীয় জীবনের মূলধারায় তাঁর অবস্থান যেমন ছিল সুদৃঢ় তেমনি জাতীয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ পুরস্কারসমূহও অবলীলায় তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। তাঁর জীবনকালে তিনি সমকালীন অন্যান্য সকল কবিদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও আলোচিত কবি হিসাবে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর ইন্তিকালের পর একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের চক্রান্তে তিনি অনেকটাই উপেক্ষিত, অবহেলিত ও কোণঠাসা হয়ে আছেন। তবে কবি হিসাবে তাঁর প্রতিভা, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কারও কোন সংশয় নেই। তা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ভাবাদর্শগত কারণে তাঁকে অবমূল্যায়িত করার অপচেষ্টা করা হয়। যদিও সাহিত্য বিচারে এ ধরনের বিষয়াদির অবতারণা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ভাবাদর্শের কারণে কখনও কোন কবি বা শিল্পীকে উপেক্ষা করা যায় না। শিল্প বা সাহিত্য বিচারের একটি বিশ্বজনীন মানদণ্ড রয়েছে। সে মানদণ্ডে যখন কেউ উৎরে যান, তখন তাঁকে আর কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। পৃথিবীর কোন কবি বা শিল্পীকে শুধু তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস ও ভাবাদর্শ দিয়ে বিচার করা হয়না, তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্যই তাঁর বিচারের প্রধান মানদণ্ড। বিশ্বাস ও ভাবাদর্শ ব্যক্তিগত বিষয়, এক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বতা রয়েছে। কবি বা শিল্পীর প্রতিভার বিচারে তাঁর জীবন ও জীবনের বিশ্বাস-আদর্শ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হতে পারে, তাঁর সৃষ্টিশীলতার মধ্যে সে বিশ্বাস ও আদর্শ কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, সেটাও আলোচিত হতে পারে। কিন্তু সর্বোপরি তাঁর সৃষ্টিকর্ম শিল্পের মানদন্ডে কতটা সার্থক ও সফল হয়েছে, সেটাই দেখার বিষয়।

প্রত্যেক সৃজনশীল প্রতিভার জীবন ও জগৎকে দেখার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। সে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তিনি তাঁর অনুভূতি, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞানের কথা শিল্পসুন্দরভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পান। তাঁর এ সৃষ্টি যদি শিল্পের বিচারে নিখুঁত ও সুন্দর হয়, তাহলেই সেটা সফল ও সার্থক। তবে এক্ষেত্রে অন্যের নিকট তা কতটা আবেদন সৃষ্টি করতে বা অন্যের হৃদয়-মনে কতটা আনন্দ বা বেদনার্ত ভাবের অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো, সে নিরিখেই শিল্পের বা কাব্যের সার্থকতা মূলত বিচার্য। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা ভাবাদর্শগত বিষয় গৌণ হয়ে দেখা দেয়।

ফররু খ আহমদের ক্ষেত্রে এ কথাগুলো বলতে হলো এজন্য যে, বর্তমানে তাঁকে তাঁর কবিতার শিল্পোত্তীর্ণতা দিয়ে নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ভাবাদর্শ দিয়ে কেউ কেউ তাঁকে বিচার করার অপচেষ্টা করে থাকেন। তবে সুখের বিষয় এই যে, এদের সংখ্যা অতি নগণ্য। ফররু খ আহমদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ভাবাদর্শ যদিও তাঁর নিজস্ব কিন্তু বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাথে তার এক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এ কারণেই একসময় তাঁর অবস্থান ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে এবং অধঃপতিত, নিগৃহীত, পরাধীন বাঙালি মুসলিম নবজাগরণ ও উজ্জীবনের বলিষ্ঠ কবিকণ্ঠ হিসাবে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি ছিল। সৌভাগ্যবশত তাঁর সে জাগরণমূলক কাব্য-কবিতা এখনও নিপীড়িত-নিগৃহীত মুসলিম জনতাকে জেগে ওঠার উজ্জীবনী শক্তিতে প্রাণচঞ্চল করে তোলে। বাঙালি মুসলিমের স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীনতা সংরক্ষণে তা এখনও অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে। তাই ফররু খ আহমদকে যে মতলবেই উপেক্ষা করা হোক না কেন, জনগণের হৃদয়ের গভীরে ও অন্ত রের নিভৃত কোণে তিনি সর্বদা জাগরূক রয়েছেন এবং থাকবেন।

এজন্য ফররু খ-চর্চার গুরু ত্ব অপরিসীম। ফররু খ-চর্চার ক্ষেত্রও নানাভাবে প্রসারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁর কাব্যের প্রকাশ, পুনঃমুদ্রণ ও প্রচার অপরিহার্য। মূলত কোন কবি বা প্রতিভাবান সৃজনশীল ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁর সৃষ্টিকর্মে। ফররুখ প্রতিভাকে অবমূল্যায়িত করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তাঁর সৃষ্টিকর্মকে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হয়েছে। প্রথমত, তাঁর সমগ্র রচনাবলি

আজও প্রকাশিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, তাঁর যেসব রচনা একসময় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও নিঃশেষিত। সেগুলো পুনর্মুদ্রণের কোনো ব্যবস্থা সেভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। সর্বোপরি বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে একসময় ফররুখের কবিতা পাঠ্য ছিল, এখন তাও অনেকটা বলতে গেলে উধাও হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে ফররুখের জীবনকালে তাঁর গান এবং কবিতা নিয়মিত বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করা হতো। কিন্তু জানিনা, কেন এখন সেগুলোর প্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। একজন শক্তিমান, প্রতিভাধর, অনন্য সৃষ্টিশীল মৌলিক কবির সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে এ ধরনের আচরণ পৃথিবীর অন্যকোন সভ্যসমাজে করা হয় কিনা জানিনা। দুর্ভাগ্যবশত, ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রে এ ধরনের অশুভ চক্রান্তমূলক দুষ্টপ্রবণতা আমাদের দেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন।

আমি ফররু খ আহমদের একজন অনুরক্ত পাঠক। শৈশব থেকে যে সকল কবির কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত, তাঁদের মধ্যে ফররু খ অন্যতম। যখন আমি হাইস্কুলে পড়ি, তখন তাঁর বিখ্যাত 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কবিতার ভাব-বিষয়, ভাষা-বর্ণনাভঙ্গি, ছন্দমিল ও অনুরণন আমাকে অভিভূত করেছিল। আমি বার বার সে কবিতা আবৃত্তি করে আবেগে মথিত, আনন্দে উল্লসিত ও কবিতার শৈল্পিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করে বিস্ময়-আনন্দে অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করেছি। ব্যক্তিগতভাবে কবির সাথে আমার পরিচয় ঘটে, যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রি নিয়ে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেছি। পরে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় রূপ নেয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাবার সুযোগ পেয়ে আমি কবিকে ব্যক্তিগতভাবে যেমন জানার সুযোগ পেয়েছি, কবি হিসাবেও তাঁকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছি। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন, আমিও তাঁর প্রতি ছিলাম শ্রদ্ধাশীল। তাঁর কাব্যের প্রতি আমার অনুরাগের ফলেই তাঁর শেষ জীবনে আমার প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যাবেলা কেটেছে তাঁর ইস্কাটনের সরকারি বাসভবনের ড্রইংরু মে। তাঁর সাথে সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। সে আলোচনা থেকে আমি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনের নানা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। এ থেকে মনে হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ এবং একজন অসাধারণ অধ্যয়নশীল জ্ঞানী, অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ বিচক্ষণ ব্যক্তি, সচেতন ও দক্ষ শিল্পী।

১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আমি বিদেশে কর্মরত ছিলাম। সেখানে বসেই আমি 'ফররু খ প্রতিভা' (প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১, প্রকাশক-বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা) নামে গ্রন্থটি রচনা করি। বিদেশে আমি সর্বপ্রথম ফররু খ আহমদের জন্ম ও মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে সভা-সেমিনারের আয়োজন করি। ১৯৯৭ সালে আমি বাংলাদেশে এসে প্রথম ফররু খ চর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমের উদ্দেশ্যে যুক্তিসহ একটি প্রস্ত াব পত্রিকায় প্রকাশ করি। কিন্তু তাতে বিশেষ সাড়া না পাওয়ায় পরবর্তী বছর অনুরূপ আরেকটি প্রস্ত াব পত্রিকায় প্রকাশ করি। এবারে অনেকের কাছ থেকেই আন্তরিক সাড়া পাই। ফলে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'ফররু খ একাডেমী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করি। আমাকে এর সভাপতি করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি 'ফররু খ গবেষণা ফাউন্ডেশন' নামে সরকারি নথিভুক্ত হয়। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে এ যাবৎ প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমার সম্পাদনায় 'ফররু খ একাডেমী পত্রিকা' নামে একটি ফররু খ বিষয়ক গবেষণামূলক সংকলন প্রকাশিত হয়ে আসছে। এযাবৎ এর বত্রিশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

ফররু খ চর্চাকে ব্যাপকতর করা এবং ফররু খ একাডেমী পত্রিকা মানসম্মতরূপে প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমি দেশের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-গবেষকদের শরণাপন্ন হই। এ ব্যাপারে অনেক খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক-গবেষক ও ফররু খ-অনুরাগীর সাথে আমি যোগাযোগ করি। প্রত্যেকেই আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে ফররু খ আহমদের উপরে লিখেছেন এবং তা যথারীতি 'ফররু খ একাডেমী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনকে– যেমন সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ডক্টর সদরু দ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউলাহ্‌, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরু জ্জামান,সানাউল্লাহ নূরী, শাহাবুদ্দীন আহমদ– ফররু খ আহমদের উপর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। অনেকেই তাতে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ ও শাহবুদ্দীন আহমদ রচিত দু'টি গ্রন্থ আমি উদ্যোগী হয়ে ফররু খ একাডেমীর পক্ষ থেকে প্রকাশ করি। সে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশের পর তাঁরা ফররু খ আহমদ সম্পর্কে আরও যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলোও আমার সম্পাদিত ফররু খ একাডেমী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে আমার সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য', প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে।

ডক্টর সদরু দ্দিন আহমদ রচিত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে তিনি নিজেই একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু সে গ্রন্থটি প্রকাশের পরেও তিনি আমার অনুরোধে আরো যেসব প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলোও পরবর্তীতে ফররু খ একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হয়। ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ মাত্র একটি প্রবন্ধ লেখার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে ইন্তিকাল করেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও ভাষাসৈনিক সানাউল্লাহ নূরীও মাত্র একটি প্রবন্ধ লেখার পর ইন্তিকাল করেন। আমার একান্ত অনুরোধে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান এবং ডক্টর মোহাম্মদ মনিরু জ্জামান ফররুখ আহমদের উপর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, উভয়েই মাত্র পাঁচটি করে প্রবন্ধ লেখার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অসুস্থতাজনিত কারণে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থ রচনার কাজ অসমাপ্ত রেখেই ইন্তি কাল করেন। তাঁরা এক একটি প্রবন্ধ রচনা শেষ করার সাথে সাথে সেগুলো আমাকে প্রদান করেন এবং আমি তা ধারাবাহিকভাবে ফররু খ একাডেমী পত্রিকায় যথারীতি প্রকাশ করি। পরবর্তীতে সেগুলো আমার সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য', প্রথম খন্ডে যথারীতি সংকলিত করি।

অবশেষে সৈয়দ আলী আহসানের ফররুখ-সম্পর্কিত লেখাগুলো একত্র করে তাঁর নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশের তাগিদ অনুভব করায় অত্র গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো। সে সঙ্গে তিনি ফররুখ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আরও দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, পাঠকের সুবিধার্থে সেগুলোও এতৎসঙ্গে সংকলিত করা হলো।

সৈয়দ আলী আহসান কবি ফররুখ আহমদের চেয়ে বয়সে দু'বছর কনিষ্ঠ। উভয়ের জন্মই যশোরে। তাঁরা পরস্পর বন্ধুপ্রতীম ছিলেন। উভয় কবি প্রায় একই সময় কাব্যচর্চায় ব্রতী হন। প্রথম কলকাতায় এবং পরবর্তীতে ঢাকায়। কাব্যচর্চার শুরুতে সৈয়দ আলী আহসান ফররুখ আহমদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও পরবর্তীতে তিনি তাঁর স্বতন্ত্র ধারায় কাব্যচর্চা করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। উভয়েই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি হিসাবে খ্যাতিমান। ২০১৮ সালে কবি ফররুখ আহমদের জন্মশতবর্ষ এবং ২০২০ সালে সৈয়দ আলী আহসানের জন্মশতবর্ষ। উভয় কবির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ফররুখ আহমদের উপর রচিত সৈয়দ আলী আহসানের ফররুখ সম্পর্কিত সবগুলো প্রবন্ধ-নিবন্ধ একত্র করে অত্র গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভবত অত্যন্ত সময়োপযোগী। আশা করি, এরদ্বারা উভয় কবির প্রতি আমাদের অপরিসীম শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

একজন কবির যথার্থ মূল্যায়ন অন্য আরেকজন বোদ্ধাকবির পক্ষেই সম্ভব। আমার ধারণা, ফররুখ চর্চা এবং ফররুখ আহমদকে সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য ক্ষুদ্রায়তন সত্ত্বেও এ গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করবেন। আশাকরি, বোদ্ধা পাঠক ও সমালোচকগণ এ গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন।

মুহম্মদ মতিউর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

কলকাতায় ফররুখ এবং আমি

একেকটি সময় থাকে যা স্মৃতিতে কখনো হারায় না। সময় পার হয়, সমস্যা আসে, সমস্যা আমরা অতিক্রমও করি, আবার জটিল কর্মব্যস্ত তায় আমরা নতুন সময়ের কাছে দায়গ্রস্ত হই কিন্তু তবু পুরাতন কয়েকটি ঘটনা মনের মধ্যে কখনো কখনো জেগে ওঠে এবং ব্যাকুল করে। সময় কখনো ধারাক্রম মেনে অগ্রসর হয় না, সময় সামনের দিকে যায়, আবার পিছনেও যায়। সময় আবর্তিত হয় কিন্তু সময় কখনো থমকে থাকে না। সময়ের আচরণটি বড় বিচিত্র। গান গাওয়া হলে গানের রেশ যেমন থেকে যায়, তেমনি কোন বিশেষ সময়কে অতিক্রম করে এলেও সে সময় বার বার আমাদের চেতনাকে নাড়া দেয়। দেগা একজন অসাধারণ চিত্রশিল্পী ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনের একটি সময় জুড়ে ছিল নৃত্যের উন্মাদনা। তিনি নৃত্য জানতেন, নৃত্য বুঝতেন। তাই সব সময় তাঁর মনের মধ্যে একটি ছবি জেগে থাকত। সেটি হচ্ছে একটি ভূমির ছবি, যে ভূমির উপর নর্তকীরা তাদের পায়ের প্রতাপ রাখত। এই পায়ের প্রতাপের কথা তাঁর মনের দৃশ্য থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি। তিনি চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁর নৃত্যের অভিজ্ঞতাকে সবসময় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

আমার জীবনের একটি সময়ে ফররু খ বড় প্রচণ্ডভাবে আমাকে গ্রাস করেছিল। আমার প্রতিদিন ফররু খের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করত এবং আমার মুহূর্তগুলো ফররু খের কলকণ্ঠে মুখর থাকত। বিকেল বেলা অপেক্ষা করতাম কখন ফররু খ আসে। বড় রাস্ত ার পাড়ে থাকতাম না, থাকতাম একটি গলির মধ্যে। সেখানেও গাড়ি যেত তবে খুব প্রবলভাবে না। মানুষের শব্দ শুনতাম, তবে তা অনেক নয় এবং জমাট নয়। ঠিক এরকম মুহূর্তে ফররু খ আসত একটি আবির্ভাবের মতো। মাথা উঁচু করে, চুল এলোমেলো করে, একটি কৌতুক ওষ্ঠে স্পষ্ট করে ফররু খ আমার সামনে আসত। এ দৃশ্যটা আজো আমার চোখে ভাসে। কলকাতার ওয়েলেসলির বাঁ দিক দিয়ে যে রাস্ত াটি কিছুদূর গিয়ে একটি গলির ভিতর গিয়ে হারিয়ে গেছে, সে গলি দিয়ে এগিয়ে গেলেই গার্ডনার লেইনে আমার মেস ছিল। মেসে আমরা যারা থাকতাম সবাই একে অন্যের আত্মীয়। সবাইকে বেশি রাত ছাড়া একসঙ্গে কখনো পাওয়া যেত না। একেকজনের একেক ধরনের চাকরি। কেউ রাত আটটার আগে বাসায় ফিরত না। একমাত্র আমি সাধারণত বিকেল ৫টার মধ্যে মেসে ফিরে আসতাম। যেদিন আমার রাতের ডিউটি থাকত সেদিন রাত এগারটায় ফিরতাম।

যেদিন ফররু খ আসত সেদিন যেন একটি উৎসবের কলগুঞ্জন শুরু হতো। মতিউল ইসলাম আসত, পীযুষ বন্দোপাধ্যায় আসত, কাজী আফসার উদ্দিন আসত। কিন্তু কাজী আফসার উদ্দিন অথবা পীযুষ নিয়মিত আসত না। তেমনি কখনো কখনো আসতেন আবুল মনসুর আহমদ আবেং আবদুল কাদির। এদের আগমনটা ছিল আকস্মিক। এরা যেতেন আমাদের গলির মুখের সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'র অফিসে। যাওয়ার পথে মেসের বারান্দায় আমাকে দেখলে উঠে আসতেন। এরা তৎকালীন সময়ের মুসলমানদের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতেন। আবুল মনসুর আহমদের কথা শুনে মনে হতো তিনি কোথাও কোন বিতর্কে অংশ নিতে যাচ্ছেন, মাঝপথে আমাকে পেয়ে তাঁর বক্তব্যের যুক্তিগুলো আমার সঙ্গে আলোচনা করে শাণিত করে নিতেন। পীযূষ মাঝে মাঝে আসত তার নতুন কোন কবিতা শোনাতে, মতিউল ইসলামও তাই। কিন্তু ফররু খ আসত অকারণ আনন্দে কথা বলতে।

আমাদের মেসের পাশেই একটি ডালপুরীর দোকান ছিল। এখানে কখনো কখনো ফররু খ গিয়ে বসত। সঙ্গে আমি থাকতাম এবং মতিউল ইসলাম। তখন সাধারণ ডালপুরীর দাম ছিল চার পয়সা। ফররু খ অর্ডার দিতো চার আনা দামের একেকটি ডালপুরী করে দেবার জন্য। প্রচুর ডাল, কাচালংকা, পেয়াজ এবং জিরের গুঁড়ো দিয়ে সে তার ডালপুরীর স্বাদ বাড়াতে বলত। সত্যিই এভাবে ডালপুরীগুলো খুব স্বাদের হতো। ডালপুরীর দোকানে যেসব লোকজন আসত তাদের সম্বন্ধে ফররু খ নানারকম কৌতুককর মন্ত ব্য করতো। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম চলনভঙ্গি দেখে সে তাদের নামকরণ করত। এই নাম ধরে সে অপরিচিত লোকটি সম্পর্কে রসালো মন্ত ব্য করত এবং আমরা প্রাণভরে হাসতাম। মানুষের জীবনে অনাবিল হাসির সময়টি খুব বেশি থাকে না। ফররু খের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল যে একটি উচ্ছলতায় সে পরিপূর্ণ ছিল। বেদনা অথবা যন্ত্রণা কি সে যেন জানতই না এবং সে কাউকে জানতেও দিতে চাইত না। একটি বিপুল বিশুদ্ধ পরিতৃপ্তি তাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল।

আমাদের মেসের দোতলায় একটি মাত্র ঘর ছিল এবং ঘরের একটি খোলা ছাদ। ছাদের চারদিকের দেয়ালগুলো বেশ উঁচু কিন্তু দেয়ালের মধ্যে অনেকগুলো ফুটো ছিল। যেখান দিয়ে পাশের বাড়ির ছাদের সবকিছু দেখা যেত। মেসের বাড়িটির উত্তরে প্রায় গায়ে গা লাগা আরেকটি বাড়ি ছিল। সে বাড়ির ছাদে একটি বড় খাঁচা ছিল। খাঁচাটিতে একটি সুন্দর টিয়াপাখি ছিল। টিয়াটির গায়ের রং যেমনটি হয়ে থাকে তেমনি অর্থাৎ হাল্কা সোনালী সবুজ, গলায় ছিল লাল রঙের বেষ্টনী। চোখ দুটো চকচকে কালো। আমি প্রায়ই এই টিয়াটিকে দেখতাম। একটি যুবতী ছাদে উঠে টিয়াটিকে খাবার দিতো। একটি বাটিতে ভেজা ছোলা, আরেকটি বাটিতে পানি। মেয়েটি এলেই টিয়াটি চঞ্চল হতো এবং যতক্ষণ মেয়েটি খাবার দিতো ততক্ষণ সে মনোযোগের সঙ্গে তা দেখত। মেয়েটির পিছনে পিছনে কোন কোন দিন একটি যুবকও আসত। যুবকটির এক পা ছিল খোঁড়া। যুবকটি মেয়েটির কোনরূপ আত্মীয়

ছিল বলে মনে হতো না। মেয়েটির কপালে সিঁদুর দেখে জানতাম যে মেয়েটি বিবাহিতা। যুবকটি ছিল পাড়ায় বহিরাগত এবং মেয়েটির সঙ্গে সে এক ধরনের প্রেমের সম্পর্ক করবার চেষ্টা করত তা বুঝতে পারতাম। ছেলেটিকে দেখলে টিয়াটি শব্দ করত। টিয়ার ডাকটি বেশ কর্কশ, মনে মতো সে প্রতিবাদ করছে।

ফররু খকে এ কাহিনী বলতে একদিন সে আমার সঙ্গে ছাদে উঠে টিয়াটিকে খুব ভালো করে দেখলো। পরে আমাকে বলল, "টিয়াটি পুরু ষ। পুরু ষ টিয়ার গলায় লাল দাগ থাকে এবং পুরু ষ টিয়া বলেই সে খঞ্জ প্রেমিকটাকে সহ্য করতে পারছে না।" একদিন আমরা ডালপুরীর দোকানে বসে ডালপুরী খাচ্ছিলাম। তখন ফররু খের ভাষায় সে 'খঞ্জ সাহেব' ভিতরে ঢুকল। তাকে দেখে ডালপুরীওয়ালা খুব বিরক্ত হলো মনে হলো। সে বলল, "বাবু আজ কিন্তু পয়সা না দিলে ডালপুরী দেবো না। আগেই অনেক ডালপুরী খেয়েছেন। কিন্তু পয়সা দেননি। লোকটি উত্তরে বলল, "তোমার কয়টিই বা পয়সা বাকী পড়েছে। সব শোধ করে দেবো। বকশিসও দেবো।" ডালপুরী খেয়ে লোকটি চলে যেতে ডালপুরীওয়ালা বলল, "বাবু এই লোকটি একটি খারাপ লোক। অন্য পাড়া থেকে আসে, এ পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে।" ফররু খ বলল "খুব বদমাইশ তো! ওর আরেকটি পা ভেঙ্গে দেয়া যায় না?" ডালপুরীওয়ালা বলল, "এ পাড়ার ছেলেরা খেপলে একদিন ওর অন্য ঠ্যাংটাও যাবে।"

মতিউল ইসলাম তখন তাঁর 'ফরিয়াদ' নামক বইটি ছাপছিল। একেকদিন সে তার প্রু ফ নিয়ে আসত এবং আমি ও ফররু খ মিলে তার কবিতার রদবদল করতাম। একদিন এক বড় কবিতা দেখে ফররু খ স্কেল দিয়ে মেপে তার প্রথম বার ইঞ্চি রেখে পরের অংশটুকু কেটে দিল। মতিউল ইসলাম প্রতিবাদ করতেই বলল, "ঘাবড়াচ্ছেন কেন? হিসেব করে দেখুন চৌদ্দ লাইনের সনেট হয়ে গেছে।" বইটি যখন ছাপা প্রায় শেষ তখন মতিউল ইসলাম উৎসর্গ পত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করল। সে বলল, "আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব আমার কবিতা পছন্দ করেন না। আমি তাই ঠিক করেছি তাঁর নামে এই বইটি উৎসর্গ করব। একটি 'নোবল রিভেঞ্জ' হবে।"

যাই হোক মতিউল ইসলাম উৎসর্গ পত্রের প্রু ফ যখন এনেছে তখন ফররু খ তাতে একটি সংশোধনী জুড়ে দিল। শামসুদ্দীন সাহেব তখন প্রভিন্সিয়াল এ্যাসেম্বলির মেম্বার। যাকে বলা হয় এম. এল. এ। ফররু খ করল কি আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের নামের পাশে এম. এল. এ কথাটি জুড়ে দিল। এর ফলে হিতে বিপরীত হয়েছিল। শামসুদ্দীন সাহেব তাঁর নামের শেষে এম, এল, এ দেখে খুব রেগে গিয়েছিলেন এবং ধারণা করেছিলেন যে মতিউল ইসলাম তার সঙ্গে পরিহাস করেছে। এর ফলে 'মোহাম্মদী' অথবা 'আজাদ'-এ মতিউল ইসলামের কবিতা ছাপানো দুরূহ হয়ে পড়েছিল। ফররু খের এ ধরনের মানসিকতা মতিউল ইসলামের জন্যও ক্ষতিকর হয়েছিল। কিন্তু ফররু খ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, "আপনি

ঘাবড়াচ্ছেন কেন? কবিতা ছাপাবার জন্য অন্যরকম ঘুষ দিতে হয়, সেটারই ব্যবস্থা করু ন। এই দেখুন না, অদ্বৈত মল্লবর্মনকে আলী রসগোল্লা খাইয়ে তার গল্প ছাপিয়েছে।" মতিউল ইসলাম আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তাই নাকি?' কথাটি অবশ্য মিথ্যা, তবুও আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। আসলে ঘটনাটা হয়েছে কি, অদ্বৈত মল্লবর্মনকে তার নিরীহ স্বভাব এবং বিনয়ের জন্য আমরা সবাই পছন্দ করতাম এবং কোন কোন দিন আমরা তাকে নিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে বসতাম। আমরা শুধু চা খেতাম কিন্তু তাকে কিছু খাবারও দিতাম যেমন টোস্ট, ডিমপোচ ইত্যাদি। এটাকে ফররু খ একটু অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলেছিল। অদ্বৈত বাবু অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি সকাল বেলা অফিসে কিছু না খেয়েই আসতেন। এটা আমরা জানতাম বলে তাকে মাঝে মাঝে খাওয়াতাম। কিন্তু সেটা লেখা ছাপাবার জন্য ঘুষ ছিল না।

অদ্বৈত মল্লবর্মন মাসিক 'মোহাম্মদী'তে অল্প বেতনে চাকরি করতেন। ছাপাবার জন্য যে সমস্ত গল্প এবং উপন্যাস আসত সেগুলো তিনি বাছাই করতেন। আমি একবার 'বুদ্বুদ' নামে একটি গল্প তার হাতে দিয়েছিলাম। ফররু খ তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। এ নামটি তার পছন্দ হল না। সে বলল, "বুদ্বুদ কোন নাম হয় না কি? এ নাম দেখলে কেউ গল্পটা পড়বেও না।" অদ্বৈত বাবু বললেন, "গল্পটা আগে পড়ে দেখি, তারপর নাম ঠিক করা যাবে।" অদ্বৈত বাবু নাম ঠিক করেছিলেন 'দি পাইপার এন্ড ডান্সার।' আমি নামটি মেনে নেইনি। শেষ পর্যন্ত 'বুদ্বুদ' নামেই গল্পটি ছাপা হয়। ফররু খ গল্পটি পড়ে মন্ত ব্য করেছিল আমার ভবিষ্যতে গল্প লিখতে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি অবশ্য পরে আর গল্প লেখায় হাত দেইনি।

ফররু খ সব সময় ভাবত যে নজরু ল ইসলামকে অতিক্রম করতে না পারলে সে বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। সে আমাকে প্রায়ই বলতো, শুধু উদ্দীপনা ও গানে নজরু ল ইসলাম মানুষকে বশীভূত করে রেখেছেন। সে একদিন নজরু ল ইসলামের কাছে গিয়ে বলেছিল, 'আমি আপনার চেয়েও বড় কবি হব।'

নজরু ল ইসলাম প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলেছিলেন, 'তুই কি লাফাতে পারিস, গান গাইতে পারিস?

ফররু খ তখন বলেছিল, 'আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে হলে লাফাতে হবে কেন?'

নজরু ল ইসলাম আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন, বলেছিলেন, 'গান ছাড়া কবিতা হয় না, বাংলা কবিতা গানেরই রাজ্য।'

নজরু ল ইসলাম ঠিকই বলেছিলেন; সেই প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে নজরু ল ইসলাম পর্যন্ত বাংলা কবিতা মূলত সুরেরই ইন্দ্রজাল। চর্যাগীতিগুলো রাগ-রাগিণী ভিত্তিক, মধ্যযুগের কবিতাও সুরে গাওয়া হতো, মাইকেল মধুসূদন দত্তও সুরের প্রতাপ অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাই দেখি তিনি মহাকাব্যের পাশাপাশি 'ব্রজঙ্গনা' কাব্য রচনা করেছেন। 'ব্রজঙ্গনা' কাব্যগ্রন্থটি কীর্তনের সুরে রচিত। আধুনিককালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নজরু ল ইসলাম সুরের রাজ্যে বিচরণ করেছেন। তবে ত্রিশের দশক থেকে বাংলা

কবিতায় সুরের ইন্দ্রজাল ক্রমশ নষ্ট হয়েছে। যেহেতু আধুনিককালে শব্দের বিচরণ ভূমি হচ্ছে বিজ্ঞান এবং কর্মচঞ্চল পৃথিবী, তাই আধুনিক কবিরা সুরের সম্মোহন ছেড়ে দিয়ে গদ্যের প্রত্যয়কে অবলম্বন করেছিলেন। এই পরিবর্তনটি নজরু ল ইসলাম অনুভব করে যেতে পারেননি। ফররু খ আহমদ কিছু গান লিখবার চেষ্টা করেছিল এক সময়ে। কিন্তু রাগ-রাগিণী সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় সে এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি। এখনকার দিনে যেসব কবি গান রচনা করে তারা সুরকারের ওপর নির্ভরশীল। অনেক সময় সুরকারের নির্দেশেই বাণী-ভঙ্গিটি তৈরি হয়। নজরু ল ইসলামের ক্ষেত্রে এটা ছিল না। ফররু খ আহমদ যে নজরু লকে অতিক্রম করতে চেয়েছিল সেটা নজরু ল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই বলেছিল। সে জানত এবং অনুভব করত যে নজরু ল ইসলামের মধ্যে এমন একটি বিশেষ প্রাণ-চৈতন্য রয়েছে যাকে শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

কলকাতায় কখনও কখনও আমি, ফররু খ ও মতিউল ইসলাম ছুটির দিনে পুরনো অঞ্চলগুলো ঘুরে বেড়াতাম। অতীতকে খোঁজা আমাদের তেমন উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল সময় কাটানো। এক ছুটির দিনে জব চার্নকের স্মৃতিচিহ্ন খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু একটি সাধারণ কবর ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই খুঁজে পাইনি। ফররু খ তখন বলেছিল, "চার্নকের আত্মা নিশ্চয়ই ভূত হয়েছে, কিন্তু কলকাতায় মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ভূতটি নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে।" সারাদিন ঘুরে দুপুরে আমরা আমজাদিয়ায় খেতে বসেছিলাম। আমাদের খাবার বিল পরিশোধ করেছিল মতিউল ইসলাম। ফররু খ আর আমি খেয়েছিলাম পরোটা-কাবাব, আর মতিউল খেয়েছিল বিরিয়ানি। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা নিউ মার্কেটের ভেতরে গিয়েছিলাম যেটাকে লোকেরা 'হগ সাহেবের বাজার' বলে। কলকাতায় লোকজনের কোলাহলে প্রায় পথই কেমন যেন যন্ত্রণাদায়ক পথ, তবু সে পথে রহস্য ছিল এবং চলতি পথে নতুন আবিষ্কারের আনন্দ ছিল।

আমি যখন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করতাম তখন আমার সঙ্গে স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন আহসান হাবীব। ফররু খকে আমি কবিতা পাঠে ডাকতাম। রোববার সকালে সাহিত্য বাসর বলে একটি অনুষ্ঠান হত। সে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল আমার। সে অনুষ্ঠানে আসতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, মোহিতলাল মজুমদার এবং আরও অনেকে। আমি এ অনুষ্ঠানে একদিন ফররু খকে কবিতা পাঠের জন্য ডেকেছিলাম। সেদিনকার অনুষ্ঠানে ছিলেন অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং একজন গল্প লেখক যার নাম আজ আর মনে করতে পারছি না। যারা সেদিনকার অনুষ্ঠানে ছিলেন তারা প্রত্যেকে ফররু খকে জানতেন এবং কবিতা পাঠ শেষে ফররু খের খুব প্রশংসা করেছিলেন। অজিত দত্ত একটু ধীর-স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ফররু খকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি ধর্মকে কবিতায় আনেন কেন? এখনকার সময় হচ্ছে মানুষের সময়। এখন কি মধ্যযুগের ধর্মের সময় আছে?" ফররু খ সেদিন খুব সুন্দর একটি উত্তর দিয়েছিল, "আমি তো ধর্ম নিয়ে

কবিতা লিখি না, আমি কবিতা লিখি ইসলাম নিয়ে এবং ইসলাম তো হচ্ছে চিরন্ত ন মানব ধর্ম।"

আমি অল ইন্ডিয়া রেডিও-কলকাতায় ধারাবাহিকভাবে আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলাম। এ আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এদের সকলের কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচ্য কবিদের তালিকায় সর্বশেষ কবি ছিল ফররু খ আহমদ। ফররু খ আহমদের ওপর আলোচনা করতে দিয়েছিলাম আবদুল কাদিরকে। কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যে বিশিষ্ট ও ব্যাপকভাবে ফররু খের এটাই প্রথম স্বীকৃতি। আবদুল কাদির প্রথমে ফররু খের ওপর বলতে চাননি, কিন্তু আমি যখন বললাম যে তাকে অন্য কোন প্রোগ্রাম দেয়া হবে না, তখন তিনি আর আপত্তি করেননি।

অল ইন্ডিয়া রেডিওতে রেজাউল করিম বলে এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে কথিকা পাঠ করতেন। আমি যোগ দেবার পর এ ভদ্রলোককে আর কোন অনুষ্ঠানে ডাকিনি। ভদ্রলোক ছিলেন 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার ভাড়াটে লেখক। তিনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তি ত্বের বিরু দ্ধে লিখতেন। তখন সারা ভারতব্যাপী পাকিস্ত ান আন্দোলন চলছে। রেজাউল করিম কংগ্রেসের সপক্ষে বক্তব্য রাখতেন, আবার কখনও কখনও সাহিত্যের অঙ্গনে এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে অসাম্প্রদায়িক বানাবার চেষ্টা করতেন। রেডিওর প্রোগ্রাম পাওয়া বন্ধ হলে ভদ্রলোক একদিন বিকেলে আমার তালতলার মেসে এলেন। ভদ্রলোকের পরণে ছিল ধূতি, পায়ে মোজা এবং ইংলিশ সু এবং মুখে বিরাট চাপদাড়ি। ভদ্রলোক রেডিওর কোন আমন্ত্রণ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করলেন। আমি বললাম, "রেডিওতে নতুন নতুন মুখ আবিষ্কার করা আমাদের কর্তব্য। আপনি তো অনেকদিন করেছেন। বর্তমানে আমরা নতুন কিছু লোককে সুযোগ দিচ্ছি।" ফররু খ হঠাৎ বলে বসল, "আপনি তো এদ্দিন হিন্দুদের কাছ থেকে প্রোগ্রাম পেতেন। এখন মুসলমানের কাছ থেকে প্রোগ্রাম পেতে হলে আপনাকে ঠিক ঠিক মুসলমান হতে হবে।" ভদ্রলোক ফররু খকে চিনতে পারেননি, জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?' ফররু খ শুধু বলল, 'আমি কবিতার ব্যবসা করি?' ভদ্রলোক ফররু খের কথা বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইলেন। আমি তখন ফররু খের পরিচয় দিলাম।

ফররু খের একটি অভ্যাস ছিল মানুষের নানা রকম নামকরণ করা। এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। কাজী আফসার উদ্দিন আহমদের নামের আদ্যক্ষরগুলো একত্র করলে দাঁড়ায় 'কাউয়া' ফররু খ তাকে 'কাউয়া' বলে ডাকত। আফসার উদ্দিন এতে কিছু মনে করত না। সিকান্দার আবু জাফরকে বলত 'আল সিকান্দার'। সিকান্দারের একটি প্রতাপী ভঙ্গি ছিল। সেজন্য এ নামটি মানানসই হয়েছিল। গোলাম কুদ্দুসকে নাম দিয়েছিল 'গদাই কদু'। কুদ্দুস আমাদের মধ্যে একটু বেশি মেদবহুল ছিল। আবুল হোসেনকে বলতো 'আবাল হোসেন'। এরা দু'জন ফররু খের দেয়া নামে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কিন্তু আহসান হাবিবের নামকরণ ছিল

সবচেয়ে খারাপ। আহসান হাবীবকে সে বলত 'ঊর্ধ্বলিঙ্গ শিব'। হাবীব লজ্জিত হয়ে প্রতিবাদ করত, কিন্তু ক্রুদ্ধ হত না। এই প্রবণতা ফররু খের অনেক দিন ছিল। ঢাকায় এসে আবদুল হাই মাশরেকীর নামকরণ সেই করেছিল। আবদুল হাই তার নাম নিয়ে বিব্রত ছিল। সে ফররু খকে বলল, "আমার আবদুল হাই নামটি খুব কমন নাম, অনেকেরই আছে। এ নামটি আমার ভাল লাগে না।" ফররু খ বলল, "তোর নামের সঙ্গে 'মাশরেকী' জুড়ে দিলাম। এখন থেকে তুই "আবদুল হাই মাশরেকী"। এ নামটি বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থাকতে ফররু খ তার পূর্ব পুরু ষের জীবনের ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লেখা শুরু করেছিল। উপন্যসটির নাম ছিল 'রু স্ত ম শাহ্‌র ঘোড়া'।[১] উপন্যাসটি কাজী আফসার উদ্দিনের পত্রিকা 'মৃত্তিকা'য় ধারাবাহিকভাবে কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি সে শেষ করেনি। কিন্তু যতটুকু প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে গতিবেগ ছিল, ভাষার একটি উজ্জ্বল দীপ্তি ছিল এবং কাহিনীর একটি সুন্দর কৌশল ছিল। 'মৃত্তিকা'র এ সংখ্যাগুলো পেলে ঔপন্যাসিক হিসেবে ফররু খের কেমন সম্ভাবনা ছিল পরীক্ষা করা যেত। নগরীর উপকণ্ঠে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কাহিনী সে লিখবার চেষ্টা করেছিল। আমি এক সময় 'গল্প সংগ্রহ' নামে দুখণ্ডে বাংলা ভাষায় মুসলমানদের লেখা গল্পের একটি সংকলন বের করেছিলাম। সেখানে ফররু খের একটি সুন্দর গল্প ছিল। বইটি এখন আমার সংগ্রহে নেই। তাই ফররু খের গল্পের নামটি কি ছিল তা বলতে পারছি না। যদ্দুর মনে পড়ে গল্পটির মধ্যে এককালের প্রতাপী একজন সম্ভ্রান্ত মুলমানের জীর্ণতা এবং গ্লানির একটি চিত্র আঁকা হয়েছিল।

ফররু খ একবার আমাকে বলেছিল যে রাসূলে খোদার জন্মকে কেন্দ্র করে একটি নাট্যকবিতা সে লিখবে যেখানে ফেরেশতাদের উল্লাসের কথা থাকবে, পৌত্তলিকদের ভয়ের কথা থাকবে এবং অগ্নিপূজকদের আগুন নিভে যাবার কথা থাকবে। শেষ পর্যন্ত এ পরিকল্পনাটি সে বাদ দেয় এবং তার পরিবর্তে 'সিরাজাম মুনীরা' নামক একটি কবিতায় রাসূলের একটি সুন্দর প্রশস্তি রচনা করে।

কলকাতায় আমার জীবনে ফররু খ ছিল আমার জন্য আশ্বাসের মত। একটি প্রশান্ত মধুর সময় আমরা তখন নির্মাণ করেছিলাম। তখন আমাদের সামনে পরীক্ষা ছিল এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। তখন আমাদের বিপরীতে ছিল বিত্তবান, রু চিশীল এবং সর্বপ্রকার প্রচার মাধ্যমের অধিকারী হিন্দুরা। তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতিভায় ছায়াচ্ছন্ন না হয়ে আমরা যে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম তা একটি ইতিহাস। এখনও আমার সেসব কথা মনে পড়ে, বিশেষ করে উজ্জ্বল দীপ্তিময়, এবং উন্নত শির ফররু খকে দৃষ্টির সামনে প্রবলভাবে দেখি। আমার স্মৃতিতে সে কখনও হারিয়ে যাবে না।

---

১. প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটির নাম ছিল : 'সিকান্দার শা'র ঘোড়া'। অসম্পূর্ণ 'উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় শ্রাবণ, ১৩৫৩ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয়। – সম্পাদক।

ফররুখ সম্পর্কে

শব্দ ও ধ্বনির সম্পৃক্ততা বিষয়ে ফররু খ অবগত ছিলেন। সে সম্পৃক্ততার ফলে যে অর্থবহতা নির্মিত হয় তাও তিনি জানতেন। ব্যাপক পড়াশুনা তাঁর ছিল, বিশেষ করে 'হাতেম তা'য়ী' পাঠ করলে তা বোঝা যায়। অনেক দোভাষী পুঁথি তিনি পড়েছেন, বিশেষ করে বিভিন্ন কাহিনীর গতিধারা অনুসন্ধানের জন্য। তিনি যে সমস্ত দোভাষী পাঠ করতেন তাহলো হাতেম তা'য়ী, কাসাসুল আম্বিয়া, আলেফ লায়লা ইত্যাদি। সেগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন। শুধুমাত্র কাহিনীর গতিধারা নির্ণয়ের জন্য নয়, অধিকন্তু শব্দের শাসন বৈচিত্র্য এবং প্রবাহের জন্য। আমি অনেকবার তাঁকে বলেছি যে, দোভাষী পুঁথিতে একমাত্র কাহিনী বিন্যাসই লক্ষ্যযোগ্য। দোভাষী পুঁথির শব্দ ব্যবহার এবং সেখানকার অর্থবহতা আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। তার কারণ শব্দের অর্থ নির্ণয় তাদের লক্ষ্য ছিল না। পুঁথিকারগণ তাদের কাহিনী বর্ণনার ব্যস্ত তায় নিমগ্ন ছিলেন।

ফররু খ আমার কথা মানতেন না। তিনি মন্ত ব্য করতেন যে, পুঁথিকারগণ বাংলা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে আরবি-ফারসি-উর্দু ধ্বনির ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ততা ঘটিয়েছেন। এটা অত্যন্ত সাহসের কথা। এই মিশ্রণের ফলে যে রকম ধ্বনি ব্যঞ্জনা গড়ে উঠেছে তা নতুন। দুঃখের বিষয় বাংলা কাব্যে এ অনুসৃতি আর কখনও হল না। ভারতচন্দ্রের সময়কালে এবং তার পরে ভুরশুট পরগণায় দোভাষী পুঁথির কবিগণের বসবাস ছিল। মনে হয় এই অঞ্চলে এই মিশ্রিত ভাষার প্রচলন ছিল। প্রচলন থাকুক বা না থাকুক এই ভাষার বিকাশ যে ছিল তা বোঝা যায়। ভারতচন্দ্র নিজেই লিখেছেন, "না রবে প্রসাদগুণ, না হবে বসাল। তাই কহি ভাষা আমি যাবনী মিশাল।"

অর্থাৎ কবিতায় প্রসাদগুণ তৈরি করতে হলে আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফররু খ সে প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিলেন এবং নিজের কবিতায় তা অর্থবহতায় ব্যবহার করেছিলেন। কবিতার সৌন্দর্যের জন্য তিনি যে ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন তা কিন্তু দোভাষী পুঁথির ছন্দ নয়। বাংলা ছন্দের প্রচলিত ধারার মধ্যে তিনি আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োজনগত যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তা আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন। ফররু খের কবিতার ক্ষেত্রেও নতুন। ফররু খের কবিতার বলিষ্ঠতা, সাবলীলতা, গীতিধর্মিতা এবং আবেগের অনুশীলন আশ্চর্যজনকভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং শ্রু তিমধুর। মূলত ফররু খ বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছিলেন তা তাঁর কাব্য- প্রবাহে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর কবিতার রূপকল্পে একটি প্রশান্ত বরাভয় ছিল। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠ করলেই তা বোঝা যায়।

ফররু খ ইসলামী কবি ছিলেন, না শুধুই কবি ছিলেন এ আলোচনা নিরর্থক। তার কারণ ফররু খের কবিতা সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল একটি বলিষ্ঠ আবেগ যে আবেগের আবেদন ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অত্যন্ত প্রাণবন্ত। তাঁর বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় একবার আমাকে বলেছিলেন, ফররু খ কোন বিষয়ে লিখছে তা আমার বিচার্য বিষয় নয়। কোন তাৎপর্যে তার শব্দগুলো বিভিন্ন চরণ বিন্যাসে দোলায়িত হচ্ছে তাই আমি দেখব। এভাবে আমরা ফররু খকে সকল শ্রেণীর পাঠকের কবি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে সমুদ্র যাত্রাপথে যে বিভিন্ন অনুষঙ্গ উপস্থিত হয়েছে তাদের রূপ-লাবণ্য অত্যন্ত মধুর। তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে ইসলাম ধর্মের শক্তি ও বিনয় প্রকাশিত হয়েছে কিনা অনেকের কাছে তা বিচার্য বিষয় হতে পারে এবং তা অন্যায়ও নয়।

আমি কিন্তু ফররু খকে অন্যভাবে দেখি। যৌবনের উদ্বেলিত আনন্দের একজন গতিমান কবি হিসাবেই আমি তাঁকে বিচার করি। 'সাত সাগরের মাঝি'তে একটি যাত্রার বর্ণনা আছে। জেমস এলোবি ফ্লেকার যে ধরনের কবিতা লিখেছেন, ফররু খের কবিতার সঙ্গে তার মিল। ফ্লেকার বলেছিলেন, 'আমরা স্বর্ণখচিত পথ ধরে সমরখন্দ ভূ-খণ্ডের দিকে যাত্রা করছি।' ফররু খ লিখেছেন, 'আমি সাত সাগর পার হয়ে হেরার রাজতোরণের দিকে যাচ্ছি।" প্রায় একই রকমের আবেগ দু'জনের কবিতায় আছে। তফাৎ শুধু এটুকুই ফ্লেকারের কবিতায় শুধুমাত্র একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, ফররু খের কবিতায় সত্য ও বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসাবে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ফররু খের সকল কবিতার মধ্যে দীর্ঘ পথযাত্রার বিবরণ আছে। যেমন 'সাত সাগরের মাঝি'তে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা আছে, তেমনি 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন দুর্গম পথযাত্রা আছে। এই পথযাত্রা অথবা সমুদ্র যাত্রা ফররু খের কবিতার একটি মৌলিক বিষয়। হোমারের ওডিসি মহাকাব্যে যেমন সমুদ্র যাত্রা প্রাধান্য পেয়েছে এবং সমুদ্র পথের বিভিন্ন সংকট অতিক্রম করে অবশেষে ইউলিসিস নিজ গৃহে আসছেন, তেমনি ফররু খ আহমদ বিভিন্ন যাত্রার শেষে শান্তি এবং আশ্বাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করছেন। আমি এভাবেই ফররু খকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে দেখি। এই বিচরণের কারণ হল সে সর্বপ্রকার সংক্ষুব্ধতা অতিক্রম করতে চায়, বিপর্যয় অতিক্রম করতে চায় এবং অবশেষে শান্তি র রাজ্যে গমন করতে চায়।

আমার ধারণা ফররু খ একজন পর্যবেক্ষণকারী দুর্গম পথযাত্রার কবি। আমি তাঁকে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের আবহে গ্রহণ করতে চাই না। আমি তাঁকে গ্রহণ করতে চাই সত্য, শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্যের আবহে। এই আবহ তাঁর কবিতায় একটি সুকুমার ছন্দ এবং সৌন্দর্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। এভাবেই ফররু খ আমাদের কাছে একটি প্রশান্ত আবেগের কবি, সৌন্দর্যের কবি এবং সৌন্দর্যের মহিমায় নিদর্শনের কবি। এভাবেই তাঁকে বিচার করতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে।

ফররু খ একাডেমী পত্রিকা, বিংশ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১০-জুন ২০১১

ফররুখ আহ্‌মদের বৈশিষ্ট্য

শব্দ ও ধ্বনির সম্পৃক্ততা বিষয়ে ফররু খ অবগত ছিলেন। সেই সম্পৃক্ততার ফলে যে অর্থবহতা নির্মিত হয় তাও তিনি জানতেন। ব্যাপক পড়াশুনা তাঁর ছিল, বিশেষ করে 'হাতেম তায়ী' পাঠ করলে তা বোঝা যায়। অনেক দোবাষী পুঁথি তিনি পড়েছেন, বিশেষ করে বিভিন্ন কাহিনীর গতিধারা অনুসন্ধানের জন্য। তিনি যে সমস্ত দোভাষী পাঠ করতেন তাহলো হাতেম তাঈ, কাসাসুল আম্বিয়া, আলেফ লায়লা ইত্যাদি। সেগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন। শুধুমাত্র কাহিনীর গতিধারা নির্ণয়ের জন্য নয়, অধিকন্তু শব্দের বৈচিত্র্য এবং প্রবাহের জন্য। আমি অনেকবার তাকে বলেছি যে, দোভাষী পুঁথিতে একমাত্র কাহিনী বিন্যাসই লক্ষ্যযোগ্য। দোভাষী পুঁথির শব্দ ব্যবহার এবং সেখানকার অর্থবহতা আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। তার কারণ শব্দের অর্থ নির্ণয় তাদের লক্ষ্য ছিল না। পুঁথিকারগণ তাদের কাহিনী বর্ণনার ব্যস্ত তায় নিমগ্ন ছিলেন। ফররু খ আমার কথা মানতেন না। তিনি মন্ত ব্য করতেন যে, পুঁথিকারগণ বাংলা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে আরবি-ফারসি-উর্দু ধ্বনির ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তি ঘটিয়েছেন। এটা অত্যন্ত সাহসের কথা। এই মিশ্রণের ফলে যে রকম ধ্বনি-ব্যঞ্জনা গড়ে উঠেছে তা নতুন।

দুঃখের বিষয়, বাংলা কাব্যে এর অনুসৃতি আর কখনও হল না। ভারতচন্দ্রের সময়কালে এবং তার পরে ভুরশুট পরগণায় দোভাষী পুঁথির কবিগণের বসবাস ছিল। মনে হয় এই অঞ্চলে সেই মিশ্রিত ভাষার প্রচলন ছিল। প্রচলন থাকুক বা না থাকুক এই ভাষার বিকাশ যে ছিল তা বোঝা যায়। ভারতছন্দ্র নিজেই লিখেছেন ঃ

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল।
প্রাচীন পন্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে॥

অর্থাৎ কবিতায় প্রসাদগুণ তৈরি করতে হলে আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফররু খ সেই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিলেন এবং নিজের কবিতায় তা অর্থবহতায় ব্যবহার করেছিলেন। কবিতার সৌন্দর্যের জন্য তিনি যে ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন তা কিন্তু দোভাষী পুঁথির ছন্দ নয়। বাংলা ছন্দের প্রচলিত ধারার মধ্যে তিনি আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োজনগত যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তা আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন। ফররু খের কবিতার বলিষ্ঠতা, সাবলীলতা, গীতিধর্মিতা এবং আবেগের অনুশীলন আশ্চর্যজনকভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং শ্রু তিমধুর। মূলত ফররু খ বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে অনুশীলণের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তা তাঁর কাব্য প্রবাহে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর কবিতার রূপকল্পে

একটি প্রশান্ত বরাভয় ছিল। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠ করলেই তা বোঝা যায়।

ফররু খ ইসলামী কবি ছিলেন, না শুধু কবি ছিলেন এ আলোচনা নিরর্থক। তার কারণ ফররু খের কবিতা সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল একটি বলিষ্ঠ আবেগ যে আবেগের আবেদন ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অত্যন্ত প্রাণবন্ত। তার বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় একবার আমাকে বলেছিরেন, ফররু খ কোন বিষয়ে লিখছে তা আমার বিচার্য বিষয় নয়। কোন তাৎপর্যে তার শব্দগুলো বিভিন্ন চরণ-বিন্যাসে দোলায়িত হচ্ছে তাই আমি দেখব। এভাবে আমরা ফররু খকে সকল শ্রেণীর পাঠকের কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রা পথে যে বিভিন্ন অনুষঙ্গ এসেছে তাদের রূপ-লাবণ্য অত্যন্ত মধুর। তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে ইসলাম ধর্মের শক্তি এবং বিনয় প্রকাশিত হয়েছে কিনা অনেকের কাছে তা বিচার্য বিষয় হতে পারে এবং তা অন্যায়ও নয়।

আমি কিন্তু ফররু খকে অন্যভাবে দেখি। যৌবনের উদ্বেলিত আনন্দের একজন গতিমান কবি হিসেবেই আমি তাঁকে বিচার করি। 'সাত-সাগরের মাঝি' তে একটি যাত্রার বর্ণনা আছে। জেমস এলোবি ফেলকার যে ধরনের কবিতা লিখেছেন, ফররু খের কবিতার সঙ্গে তার মিল রয়েছে। ফ্লেকার বলেছিলেন, আমরা স্বর্ণখচিত পথ ধরে সমরখন্দ ভূ-খন্ডের দিকে যাত্রা করছি। ফররু খ লিখেছেন, আমি সাত সাগর পার হয়ে হেবার রাজতোরণের দিকে যাচ্ছি। প্রায় একই রকমের আবেগ দু'জনের কবিতায় আছে। তফাৎ শুধু এটুকুই ফ্লেকারের কবিতায় শুধুমাত্র একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, ফররু খের কবিতায় সত্য ও বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসেবে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ফররু খের সকল কবিতার মধ্যে দীর্ঘ পথযাত্রার বিবরণ আছে। যেমন সাত সাগরের মাঝিতে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা আছে, তেমনি হাতেম তা'য়ী কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন দুর্গম পথযাত্রা আছে। এই পথযাত্রা অথবা সমুদ্র-যাত্রা প্রাধান্য পেয়েছে এবং সমুদ্র-পথের বিভিন্ন সংকট অতিক্রম করে অবশেষে ডিলিসিস নিজ গৃহে ফিরে আসছেন, তেমনি ফররু খ আহমদ বিভিন্ন যাত্রার শেষে শান্তি এবং আশ্বাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করছেন। আমি এভাবেই ফররু খকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে দেখি। এই বিচরণের কারণ হল সে সর্বপ্রকার সংক্ষুব্ধতা অতিক্রম করতে চায়, বিপর্যয় অতিক্রম করতে চায় এবং অবশেষে শান্তি র রাজ্যে গমন করতে চায়।

আমার ধারণায় ফররু খ একজন পর্যবেক্ষণকারী দুর্গম পথযাত্রার কবি। আমি তাঁকে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের আবহে গ্রহণ করতে চাই না। আমি তাঁকে গ্রহণ করতে চাই সত্য, শৃংখলা এবং সৌন্দর্যের আবহে। এই আবহ তাঁর কবিতায় একটি সুকুমার ছন্দ এবং সৌন্দর্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। এভাবেই ফররু খ আমাদের কাছে একজন প্রশান্ত আবেগের কবি, সৌন্দর্যের কবি এবং সৌন্দর্যের মহিমাময় নিদর্শনের কবি। এভাবেই তাঁকে বিচার করতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে।

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৯ম সংখ্যা, জুন, ২০০৪]

ফররুখ আহমদের ‘সাত সাগরের মাঝি’

ফররু খ আহমদ সম্পর্কে কোন কিছু বলার আগে সকলকে একটি কথা জানানোর একান্ত প্রয়োজন যে, জীবিতকালে সে আমার একান্ত ছিল। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় আমার অব্যবহিত পূর্বে আমরা প্রায় প্রতিদিন এক জায়গায় মিলিত হতাম। আমি থাকতাম তালতলা গার্ডেন লেইনের একটি মেসে। মেসে থাকতেন আমার এক ভগ্নিপতি এবং তাঁর কয়জন ভাই। আমি নিচের তলাতেই প্রথম ঘরে থাকতাম। ফররু খ সেখানে প্রতিদিন বিকেলে বা সন্ধ্যার সময় আসতো। সেই সঙ্গে আসতো কখনও কখনও মতিউল ইসলাম, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ এবং বয়স্কদের মধ্যে আসতেন আব্দুল কাদের এবং আবুল মনসুর আহমদ। এঁরা নিয়মিত আসতেন না, কখনও আমার মেসের সামনে দিয়ে কোথাও যাচ্ছেন সেই সময় একটু উঁকি দিয়ে যেতেন। নানা বিষয়ে আমরা আলোচনা করতাম। প্রধান আলোচনাটা ছিল ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে আমাদের অবস্থিতি নিয়ে। ফররু খ এবং আমি কখনও কখনও বাইরে রেড়াতে বেরু তাম। আমাদের গাড়ি ছিল না কিন্তু দুটি পা ছিল। আমরা হেঁটেই কোলকাতার শহর ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের আর্থিক উপার্জন কারোও খুব বেশি ছিল না। তাই আমাদের পায়ে হেঁটে পথ চলতে হত এবং চতুর্দিকের শোভা উপলব্ধি করতে হত। সে এক বিস্ময়কর সময় গেছে। আমরা উভয়ে জানতাম যে, আমরা আছি এবং বেশ প্রসন্নভাবেই আছি। আজ দীর্ঘকাল পরে একনও যখন বাড়িতে কেউ আসেন এবং ঘন্টা ধ্বনি করে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করেন তখন আমার হঠাৎ মনে হয়, এই বুঝি ফররু খ আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অল্পক্ষণে সচেতন হয়ে বুঝতে পারি যে, এ সময় তাঁর আর আসার কথা নয়। পুরনো দিনের প্রত্যাশা শুধু স্মৃতি হয়ে আমার মনে জেগে উঠেছে। কোলকাতায় আমাদের আরও বন্ধু ছিল। যেমন সিকান্দার আবু জাফর, আবু রু শদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন এবং গোলাম কুদ্দুস। কিন্তু তাঁদের নিয়ে তেমন আড্ডা নিয়মিত কখনও বসতো না। ফররু খের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। বোধ হয় আমাদের মধ্যে বিশ্বাসগত একটা অঙ্গীকার ছিল। আমরা আছি এবং একে অন্যের সান্নিধ্যে আছি। এই প্রত্যয় নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলব। আমরা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতাম, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতাম এবং অনেক তুচ্ছ বিষয় নিয়েও এভাবেই সময় কাটাতো। চা আসত, ডালপুরি আসত এবং আমাদের সময় সামনের দিকে অগ্রসর হত। আজ অনেকদিন পর মনে হয় এখন আমি বড় অসহায় এবং একাকী হয়ে পড়েছি। আমার পরিবেশ আমাকে নির্জনতার দিকে ঠেলে

দিয়েছে। ফররু খ এক সময় এই নির্জনতাকে ভেঙ্গে দিত। এখন নির্জনতা ভাঙ্গার কোন লোক নেই।

সেই চল্লিশের দশকে যখন আমাদের বিচরণ তখন আমাদের পশ্চাদে ছিল বিপুল নাস্তি । ইংরেজী সাহিত্যের কয়েকজন অধ্যাপক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এসে ইউরোপের অনিশ্চয়তা এবং সংকটকে বাংলা ভাষায় রূপান্ত রিত করবার চেস্টা করেছিল। তাঁরা ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ। এঁদের একমাত্র কাম্য ছিল ইউরোপের জীবনধারার হতাশা এবং দুঃখবোধকে বাংলা কাব্যে একটি বিশিষ্টতায় প্রকাশ করা। এই বিশিষ্টতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁরা ধর্মবিশ্বাস থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছিল। এভাবে একটি ভাঙচুরের খেলা কবিতার অঙ্গনে এসেছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল অবিশ্বাসের একটি কলরব। জীব ও সৃষ্টিকে তাঁরা আজন্ম অনাথ বলেছেন। এই নিয়ে বিস্তৃ ত আলোচনা পরে হবে। কিন্তু এখানে বলতে চাই যে, এদের পরপরই আমরা কয়েকজন এসেছিলাম বিশ্বাসকে বরণীয় করে। এক্ষেত্রে সত্য ও আনন্দের নির্দেশনা এনেছিল ফররু খ আহমদ। ফররু খ কিন্তু প্রথমেই এই বিশ্বাসের মধ্যে জেগে উঠেনি। কিন্তু ঐ শহর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে তাঁর মনে একটি পরিবর্তন আসে। সেই পরিবর্তনটি হচ্ছে ইসলামের মধ্যে নতুন করে প্রবেশ করা। সে তাঁর কাব্যগৃন্থ “সাত সাগরের মাঝি” দিয়ে একটি দুনির্বার যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। তার মধ্যে রোমান্টিকতা ছিল এবং এই রোমান্টিকতা ছিল সর্বপ্রকার ভীতি এবং সম্পদে থেকে মুক্ত হবার রোমান্টিকতা। আমিও সেই সময় ফররু খের মত কবিতা লিখতাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ফররু খের বলয় থেকে বেরিয়ে এবং আমার বিশ্বাসকে অন্যভাবে পাবার চেষ্টা করলাম। সেই সময়ের কথা মনে পড়লে আজও অবাক লাগে যে, কি করে আমরা আমাদের কাব্যগ্রন্থকে ভাগ করে নিয়েছিলাম। নাস্তি কতা আমাদের কাছে অপরাজেয় হতে পারে। শোভনতা, সংহতি এবং বিশ্বাসের বিভূতিকে আমরা স্পর্শ করে নিতে চেয়েছিলাম। তখন মনে হত একটি বিষয় যেন আমাদের জীবন, চিন্ত া এবং চৈতন্যকে আশ্রয় করে উঠেছিল এবং সে হচ্ছে আমি আমার বিশ্বাসের মধ্যে আছি এই বিশ্বাসটুকু।

ফররু খ সৈয়দ বংশের ছেলে এবং আমিও তাই। আমি পারিবারিক সূত্রে সৈয়দ উপাধিটি ব্যবহার করি। এতে আমার আনন্দ এবং অহমিকা জাগে। সৈয়দ উপাধিটি ধারণ করলে মনে হয় আমি একটি বিরাট চৈতন্যের অংশ বিশেষ। আমাদের পারিবারিক ধারার মধ্যে সূফী মতবাদটি প্রবল ছিল এবং এখনও আছে। ফররু খের পরিবারের মধ্যে বংশ পরম্পরাক্রমে তাঁরা সৈয়দ কিন্তু তাঁর পূর্বপুরু ষ সূফী ধারায় দীক্ষিত ছিল না। তাঁর পিতা বৃটিশ আমলে জাদরেল পুলিশ ইন্সপেকটর ছিলেন। বেশ প্রতাপী পুরু ষ হিসাবে তাঁর একটা পরিচয় ছিল। ফররু খ কিন্তু এতে গর্ববোধ করত না। তাঁর কাছে সৈয়দ এবং প্রতাপ দুটি ছিল পরস্পর বিরীতধর্মী। তাই ফররু খ জীবনে কখনও সৈয়দ উপাধিটি ধারণ করেনি। কোলতাকায় থাকতে আমি

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কেন সে সৈয়দ উপাধিটি ব্যবহার করে না। ফররু খ উত্তরে বলেছিল, যে তাৎপর্য নিয়ে আমি রসূলের বংশধর হিসাবে দাবী করব সে তাৎপর্যের কোন কিছু আমার মধ্যে নেই। তাছাড়া আমি উত্তরাধিকার সূত্রে সৈয়দ উপাধিটি পেয়েছি। এটা আমার কর্মলব্ধ নয়। সুতরাং আমি সৈয়দ ব্যবহার করি না। ফররু খ এক সময় তাঁর পিতার এবং তাঁর পারিবারিক জীবন-তথ্য অবলম্বন করে একটি উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছিল। উপন্যাসটির নাম 'রু স্ত ম শাহের ঘোড়া'। কাজী আফসার উদ্দীন আহমদের 'মৃত্তিকা' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এর কিছু অংশ ছাপা হয়েছিল। উপন্যাসটি ফররু খ শেষ করতে পারেনি। প্রথম দিকে ফররু খ কিছু গল্প লিখেছিল। বেশ বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে গল্পগুলি লিখেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ফররু খের মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে এবং ধর্মীয় চিন্ত ায় সে উদ্বুদ্ধ হতে থাকে। কোলকাতায় মাওলানা আবদুল খালেকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁর উপর ফররু খ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মাওলানা আবদুল খালেক ফররু খের জীবনকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। এ পরিবর্তনটা আমরা বুঝতে পারতাম। কিন্তু এ নিয়ে ফররু খ আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতো না। ফররু খ খ্রিস্টান কলেজে পড়েছে। কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই সময় ফররু খ ধর্মবিরোধী একটি নাস্তি কতার দিকে চলে যেতে পারতো, কিন্তু সে যায়নি। নতুন এক ধরনের বিশ্বাসের সাম্রাজ্যের মধ্যে ফররু খ চলে আসে। এই সময় কোলকাতায় কবি বেনজীর আহমদ ফররু খকে নিয়ে পথে পথে ঘুরতেন। আমার এখনও মনে আছে ফররু খের 'সাত সাগরের মাঝি' বইটি যখন বের হয় তখন কবি বেনজীর আহমদ ফররু খকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন লেখকের বাড়িতে গিয়েছেন এবং পুস্ত কটি বিতরণ করেছেন। বেনজীর আহমদ সুখে-দুঃখে ফররু খের সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত থাকেন।

ফররু খের পিতার সঙ্গে ফররু খের সখ্যতা কখনও গড়ে উঠেনি। একটি বয়সে পুত্র পিতার মিত্র হন কিন্তু ফররু খের বেলায় তা ঘটেনি। তাঁর পিতা প্রতাপী পুলিশ অফিসার ছিলেন এবং সেই প্রতাপ তিনি নানাভাবে প্রদর্শন করতেন। এটা ফররু খের কখনো মনঃপুত হয়নি। তাই দেখতে পাই, অল্প বয়সে ফররু খ গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে আসে। স্কুলের পড়াশুনাও গ্রামে হয়নি। খুলনা শহর থেকে তিনি মেট্রিক পরীক্ষা দেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের পাঠশালায় হয়। সেখান থেকে কোলকাতায় চলে আসেন। কোলকাতায় বালিগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু কেন তিনি খুলনায় গিয়ে জেলা স্কুলে পরীক্ষা দিলেন তার কারণ স্পষ্ট নয়। তাঁর পিতার প্রতাপে গ্রামে তাঁর জন্য একটি বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সে জন্য তাঁকে কোলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল। পিতা পুত্রের ক্ষুব্ধ মানসিকতার বিরু দ্ধে দাঁড়াননি। এরপর থেকেই ফররু খের নাগরিক জীবন আরম্ভ। নাগরিক জীবনের কোলাহল, ক্ষুব্ধতা এবং বিশৃঙ্খলা ফররু খকে বিচলিত করেনি কখনও। কোলকাতায় যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সাড়া পড়ে গিয়েছে সেই সময় দুর্ভিক্ষে

বাংলাদেশ জরাজীর্ণ হয়ে যায়। ফররু খ একটি কবিতায় লিখেছে যে, পৃথিবী অত্যন্ত অশান্ত। মানুষের মনে শান্তি নেই এবং সে মন বাধাগ্রস্ত। মৃত্যু মানুষের জীবনে একটি কদর্যতা ও কলুষতা লেপন করেছে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছাপ 'লাশ' কবিতায় ধরা পড়েছে। বাংলা ১৩৫০ সালকে উপলক্ষ্য করে এই কবিতা লেখা হয়েছিল। কোলকাতার পথে পথে কত লোক যে মরে পড়ে থাকত তার ইয়ত্তা নেই এবং ফররু খের ভাষায় ক্ষুধার্ত মানুষ অসাড় হয়ে পথে পড়ে থাকত। কিন্তু সন্ধ্যাকালে এই যে মানুষ বাড়ি ফিরত কাজ থেকে, তাঁরা কোনদিন এই মৃত মানুষের খবর রাখতো না।

ফররু খ গ্রাম থেকে চলে এলেও গ্রামকে ভুলেনি। তাঁর গ্রামের বাড়িতে প্রচুর গাছ ছিল। তখন যশোর অঞ্চলে গাছপালার মহিমা দেখা যেত। এখনও আছে। তবে আগের মত নেই। প্রচুর নারিকেল গাছ, খেজুর গাছ এবং আম গাছ ফররু খের গ্রামের বাড়িতে ছিল। তাঁর কবিতায় বারবার খেজুর গাছের কথা এসেছে। শহরের কোলাহলেও গ্রামের খেজুর গাছের কথা সে বিস্মৃত হয়নি। খেজুর গাছের কথার সঙ্গে সঙ্গে নারিকেল গাছের কথাও এসেছে। আমি এসব কথা ফররু খকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ফররু খ তার কলেজের পাঠ্যাবস্থায় যাদবপুরে থাকত। কিন্তু সহজে বাড়ি ফিরত না। কোলকাতা শহর তন্ন তন্ন করে ঘুরে সে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরত। তার বন্ধুবান্ধব গড়ে উঠেছিল কোলকাতা শহরে। তাদের বাড়িতে আড্ডা দেয়া ছিল তার নিত্যবৈমিত্তিক ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোলকাতার শহরে কবি বেনজীর আহমদ একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। কবি হিসেবে, রাজনীতিবিদ হিসেবে এবং দুর্ধর্ষ ডাকাত হিসেবে বেনজীর আহমদ ফররু খকে নিয়ে কোলকাতায় ঘোরাফেরা করতেন। বেনজীর আহমদের সঙ্গে ফররু খের আবার মাঝে মাঝে বিরোধও হয়েছে। ফররু খ স্বাধীনচেতা ছিলেন। সে বেনজীর আহমদের নির্দেশে গড়ে উঠতে চায়নি। তাই বেনজীরকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। কিন্তু বেনজীর ফররু খকে কখনও ভুলতে পারেননি। ফররু খ ছিল তাঁর একান্ত স্নেহভাজন কিন্তু বেনজীরের রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ফররু খের ছিল না। তাই ফররু খ তাঁর নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছিল। প্রশ্ন উঠে এই নিজস্ব পথটা কি? এই প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যাবে না। নজরু ল ইসলামের মত নিজস্বতা তাঁর ছিল না। নজরু ল ইসলাম নিজে বলেছেন যে, তাঁর মন যা চায় তাই করেন। কিন্তু ফররু খ সে রকম ছিলো না। ফররু খ একটি নিজস্ব ধারা নির্মাণ করে তুলেছিলো। আগেই বলেছি, মাওলানা আবদুল খালেকের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে জীবন ক্ষেত্রে ফররু খের নতুন গতিবিধি তৈরি হয়েছিল। তার প্রমাণস্বরূপ আমরা 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থটি পাই। এই কাব্যগ্রন্থটি পুরোপুরি মাওলানা আবদুল খালেকের প্রেরণাতে লেখা। ঢাকার বনানী বাজারে মাওলানা আবদুল খালেক থাকতেন। ফররু খ সময় পেলেই সেখানে যেত। সিরাজাম মুনীরা প্রথম প্রকাশের পর ফররু খ এই জ্ঞান-তাপসের

হাতেই গ্রন্থটি উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। আমি নিজে ফররু খের সঙ্গে কয়েকবার মাওলানা আবদুল খালেকের বাসায় গিয়েছি। আমি দেখেছি মাওলানা সাহেব ফররু খকে নিয়ে আলাদা বসতেন এবং নীচু কণ্ঠে কিছু কথা বলতেন, যেগুলো আমি শুনতে পেতাম না। মাওলানা আবদুল খালেকের প্রভাব তাঁর উপর যে কত প্রবল ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। সূফীতত্ত্বের একটা নিগূঢ় রহস্য আছে, যারা এই তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি তারা এই রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হবেন না। ফররু খ কতটা সফলকাম হয়েছিল সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু এইটুকু আমরা জানি যে, ফররু খ একটা অকুণ্ঠ বিশ্বাসের রাজ্যে বাস করতো। আমি কখনও তাকে তার এই বিশ্বাসের পরিমণ্ডল নিয়ে প্রশ্ন করিনি। ফররু খের কবিতা বিশ্লেষণ করতে হলে তার জীবনের সকল প্রকার ব্যক্তিগত দিক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। যেহেতু ফররু খের নানা শ্রেণীর বন্ধুবান্ধব ছিল, তাই কারো পক্ষে নিঃসঙ্কচিত্তে ফররু খের অন্ত রঙ্গ পরিচয় খুঁজে বের করা সম্ভব ছিল না। সে নাস্তি কের সাথেও মিশতে পারত এবং পরিহাস রসিকতায় নাস্তি কের বিচার-বিবেচনাকে উড়িয়ে দিতে পারত। আবার একজন বিশ্বাসীকে সে নানা প্রশ্নে নাস্ত ানাবুদ করে ফেলত। মনে হত ফররু খ নিজেকে নিয়েই সদা ব্যস্ত । সে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হত না। আমাকে সে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছিল নানাভাবে। কিন্তু কেন জানি আমি আমার কবিতার জন্য ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলাম। বর্তমান নিবন্ধে আমি ফররু খের কাব্যধারা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব এবং তার কাব্যগ্রন্থের অন্ত র্লীন রহস্যকে উদঘাটন করবার চেষ্টা করব। কতটা সফলকাম হব জানি না। কিন্তু ফররু খকে জানবার অদম্য কৌতুহল আমার সবসময় ছিল। সেই কৌতুহলের প্রচেষ্টায় এই রচনা।

'সাত সাগরের মাঝি' ফররু খের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন বেনজীর আহমদ। আমার মনে আছে আমি কখন কোলকাতায় এবং একদিন দ্বিপ্রহরে ওয়েলিলিস স্ট্রীটে সওগাত অফিসে ছিলাম। সে সময় বেনজীর আহমদের সঙ্গে ফররু খ আহমদ সওগাত অফিসে প্রবেশ করে। তার বগলে একটি বইয়ের প্যাকেট ছিল। ফররু খ চেয়ারে বসে টেবিলের উপর বইগুলো রাখলো এবং একটি বইয়ের উৎসর্গ পত্রে লিখল 'সৈয়দ আলী আহসান কল্যাণায়েষু'। তার নিচে নাম স্বাক্ষর করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি রকম হল? কল্যাণায়েষু তো কেউ লেখে না, লেখে করকমলেষু। ফররু খ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, দেবীর করকমলে হিন্দুরা অর্ঘ্য অর্পণ করে অথবা চরণ কমলেও করে। আমি তাই করকমলেষু গ্রহণ করি না। কল্যাণায়েষূ বললে ইরানকে বোঝায় এবং মুসলমানদের জীবন চর্চা বোঝাবে। শওকত ওসমান তখন সেখানেই ছিল। ফররু খ তাঁকে কোন বই দিল না। আমি তখন বললাম, শওকতকে বই দিলে না? ফররু খ বলল, পরে দেব। এখন ওর সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই। ফররু খ চলে যাবার পর শওকত ওসমান আমাকে বলল, 'আলী, তুমি ফররু খের চোখ দুটো দেখেছো? কি রকম অসাধারণ দৃঢ় এবং তীক্ষ্ণ মনে হয় না?' আমি বললাম, 'তোমার কথায় মনে

হচ্ছে সত্যিই তাই। আমি আগে ভাল করে লক্ষ্য করিনি।' 'সাত সাগরের মাঝি' যখন প্রকাশিত হয় তখন ফররু খ আই জি প্রিজন অফিসে কেরানীগিরী করতেন। তারপর যোগ দিয়েছিলেন কোলকাতার সিভিল সাপ্লায়ার অফিসে। 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফররু খ অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠলেন সকল মহলেই। গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় ফররু খের কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সাল থেকেই ফররু খের কবিতা মাসিক 'মোহাম্মদী', 'সওগাত' এবং 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। সে সময় আমারও একই ধাঁচের কিছু কবিতা মাসিক 'মদিনা'তে প্রকাশিত হয়। আমাদের উভয়ের রচনাভঙ্গি তখন প্রায় একই রকমের ছিল। ফররু খ চেয়েছিল আমি যেন এ ধারাটি বজায় রাখি। কিন্তু ফররু খের তাপমান আরো অনেক ঊর্ধ্বে। আমি তাই নিজস্ব ধারা খোঁজ করতে আরম্ভ করলাম। সেই সময়কার 'সওগাত' পত্রিকায় আমার কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলো ছিল সমাজতান্ত্রিক। এই সময় টি এস এলিয়টের কিছু কবিতা সওগাতে প্রকাশ করেছিলাম। তখন আমাদের কাব্য জগতে যাওয়াই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে ফররু খ যে পরিবর্তনটা আনল তা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

ত্রিশের দশকের বিশিষ্ট কবিরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং শিক্ষক। বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দেব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ সকলেই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের মনোজ্ঞ পাঠক এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। তাঁদের কবিতায় আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব পড়ে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রীয় মানুষের একটি প্রত্যয়ও তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁরা সকলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন। তবে সুস্পষ্টভাবে বলেননি কিন্তু সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ সময়কার কবিদের পরের প্রজন্মে ফররু খই প্রথম কবি, যিনি বিশ্বাসকে কবিতার বিষয়বস্তু করলেন। এই বিশ্বাসটা হচ্ছে ইসলামের উপর নির্ভরশীলতা এবং ইসলামি আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস। নজরু ল ইসলাম তাঁর কাব্যে যেভাবে বিশ্বাসকে সমাদৃত করেছেন, ফররু খ সেভাবে করেননি। নজরু ল ইসলাম হিন্দু ধারার সাধনা এবং মুসলমানদের ধারার সাধনা উভয়ই সমর্থন করেছেন। কিন্তু ফররু খ একমাত্র ইসলামি বিশ্বাসেরই উজ্জীবন ঘটিয়েছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হচ্ছে এই, সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কবিবরাও ফররু খের বাণীভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমি নিজে জানি যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সুধীন দত্ত ফররু খের কবিতার প্রশংসা করতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র অবশ্য বলেছিলেন যে, মোহিতলাল মজুমদারের ছন্দভঙ্গি আয়ত্ত করে ফররু খ সুন্দর কবিতা লিখে থাকেন। অর্থাৎ একটি কথা বলা যায় যে, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৫ সালের মধ্যে ফররু খের খ্যাতি এবং পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আমরা যে কয়েকজন কবিতা লিখতাম যেমন ফররু খ, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব এবং আমি। আমাদের মধ্যে ফররু খ এবং আবুল হোসেনের কবিখ্যাতি সেই সময় আমাদের সকলের চেয়ে বেশি ছিল। আরেকজন

কবি ছিলেন। তাঁর নাম 'গোলাম কুদ্দুস'। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি একটি গোত্রের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরও একটি পরিচিতি ছিল। সেটি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিকতার কারণে। আবুল হোসেনেরও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল প্রায় একই সময়ে। সেটির নাম ছিল 'নব বসন্ত '। আবুল হোসেন কবিতায় গদ্যভঙ্গির অনুসরণ করেছিলেন। অনেকটা বুদ্ধদেব বসুর 'নতুন পাতা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর মত। আবুল হোসেনও ফররু খের মত বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁর মধ্যে বিশ্বাসের কোন প্রতাপ বা প্রকাশ্য ব্যঞ্জনা ছিল না।

ফররু খের 'সাত সাগরের মাঝি'তে সমুদ্রের কথা বারবার এসেছে। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোতে বিশেষ করে 'হাতেম তায়ী' গ্রন্থে সমুদ্রের বর্ণনা এসেছে। মহাসমুদ্রের প্রতি ফররু খের একটি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ফররু খ যে সমুদ্রের বর্ণনা দিয়েছে তা কতটা যথাযথ? ফররু খ কি সমুদ্র দেখেছিল? আমি জানি সে কখনও সমুদ্র দেখেনি। কোলকাতায় থাকতে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ডায়মন্ড হারবারে গিয়েছিলাম সমুদ্র দেখতে। এ দলের মধ্যে আমিও ছিলাম। মাহবুবুর রহমান খান ছিলেন। মতিউল ইসলাম ছিলেন। ফররু খের থাকার কথা ছিল। কিন্তু কেন যেন ফররু খ শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে যেতে পারেনি। দেশবিভাগের পর ফররু খ ঢাকায় চলে আসলো এবং আমৃত্য ঢাকাতেই অবস্থান করে। ঢাকার বাইরে সে কখনও যায়নি। চট্টগ্রামে যাবার আমন্ত্রণ সে পেয়েছিল। কিন্তু যায়নি। আমি গিয়েছিলাম চট্টগ্রাম। পাকিস্ত ান যাবার আগে একবার করাচি যাই। সে আমন্ত্রণ পায় কিন্তু করাচি সে যায়নি। রাইটার্স গিল্ডের একটি আমন্ত্রণ সে পেয়েছিল কিন্তু এই আমন্ত্রণ সে রক্ষা করেনি। ১৯৬১ সালে দিল্লীতে একটি কালচারাল ডেলিগেশনে আমরা অনেকে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফররু খ আমন্ত্রিত হয়েও যায়নি। সুতরাং ফররু খ সমুদ্র দেখার সুযোগ কখনও পায়নি।

বাংলা কাবিতায় সমুদ্র এসেছে অনেক সময় অনেকভাবে। মধ্যযুগেও সমুদ্রের কথা কাব্যে আমরা পেয়েছি। কিন্তু মধ্যযুগের কাব্য বিবরণটা ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মধ্যযুগের কবিরা কেউ সমুদ্র দেখেননি। তাই কাব্যে সমুদ্রের বিবরণ তাঁদের অন্ত ঃসারশূন্য। সমুদ্রের উপর তাঁরা দেবত্ব আরোপ করেছেন এবং কল্পনা করেছেন যে, সমুদ্রের তলদেশে একটি বিরাট বর্ণাঢ্য জনপদ আছে। সেখানে সদাসর্বদা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়। আলাওল এর 'পদ্মাবতী' কাব্যে সমুদ্রের বিবরণ আছে। অবশ্য আলাওল এই বিবরণটা পেয়েছিলেন মালিক মোহাম্মদ জায়সির কাব্য থেকে। অবশ্য জায়সিও সমুদ্র দেখেননি। তাঁর জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এটা জানতে পারি। বিখ্যাত হিন্দী কবি তুলশী দাশের 'রামচরিত্র মানস' কাব্যে সমুদ্রের বিবরণ এসেছে। কিন্তু সেখানেও বিবরণটা কাল্পনিক। তুলশী দাশও জীবনে কখনও সমুদ্র দেখেননি। দু'ভাষাবিদদের মধ্যেও অনেক সমুদ্রের কাল্পনিক বিবরণ এসেছে এবং সেগুলোর কোনটা গ্রহণযোগ্য নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমুদ্র পথে বিলেতে গিয়েছিলেন। তখন সমুদ্রগামী জাহাজই বিদেশে

যাবার একমাত্র অবলম্বন ছিল। সুতরাং মধুসূদন দীর্ঘ এক মাস জাহাজে থেকে সমুদ্র দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সমুদ্রের বর্ণনা অনবদ্য এবং যথার্থ।

'মেঘনাদ বধ কাব্যে' সমুদ্রের বর্ণনা আছে। সমুদ্র দর্শন করে রাবণের ক্ষেদোক্তি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। নবীন সেনের কাব্যে সমুদ্রের কথা এসেছে। তিনি অবশ্য বিস্ত ৃতভাবে সমুদ্রের বর্ণনা দেননি কিন্তু সুন্দরভাবে সমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষোভের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও বহুবার বিদেশে গিয়েছেন। জলপথে জাহাজে করেই তাঁকে যেতে হয়েছে। তিনি প্রথম যৌবনে জাহাজে করে ইউরোপ গিয়েছেন। পরিণত বয়সে জাপানে গিয়েছেন। জাভা, সুমাত্রায় গিয়েছেন। সব জায়গায় তাঁকে যেতে হয়েছে জাহাজে করে। সুতরাং সমুদ্রের বিশালতা তিনি দেখেছেন, তার বিস্ত ার দেখেছেন এবং তার স্রোতের বিক্ষুব্ধতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। সমুদ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে। যদিও তা খুব ব্যাপকভাবে নয়। আমি আমার জীবনে সমুদ্র দেখেছি বহুবার। চট্টগ্রামে যতদিন ছিলাম সমুদ্র সৈকতে প্রায় যেতাম। ইংল্যান্ডের এক্সজেটার অঞ্চলে গিয়েছি এবং সেখানেও সমুদ্রের দর্শন ঘটেছে। ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরো শহরে সমুদ্রের তীরে সময় কাটিয়েছি। সমুদ্রের প্রতি আমার একটা মহা প্রশস্ত তা আছে। আমার অনেক কবিতায় সমুদ্র এসেছে। সে সমস্ত চিত্রের মধ্যে যে কোন পাঠক প্রত্যক্ষ সমুদ্র দেখবার অনুভূতি পাবে। কিন্তু ফররু খ কখনও সমুদ্র দেখেনি। কিন্তু সমুদ্র নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ছিল বোঝা যায়। সে কল্পনায় যতটা পারে ততটা সমুদ্রকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। সে যেভাবে সমুদ্রকে নির্মাণ করেছে, তা সত্যিই অসাধারণ। সে সমুদ্রের বিস্ত ার, স্থবিরতা এবং তরঙ্গ ক্ষুব্ধতার কথা বলেছে। অবশ্য বহুবার দিগন্তে র কথা বলেছে যে, দিগন্তে গাছপালা দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্রে তো কোন দিগন্ত নেই। দৃষ্টি যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখানে আমরা অনন্ত বিনিঃশেষকে দেখি। ফররু খ দ্বীপের কথাও বারবার বলেছে। আবার বন্দরের কথাও বলেছে, যেখানে জাহাজ নোঙ্গর ফেলে। এই র্বণনাগুলো যথাযথবাবে মহাসমুদ্রের নয়। এগুলো সুদূরপ্রসারী দরিয়ার অর্থাৎ নদীর। ফররু খের বর্ণনায় উদ্দাম ঢেউয়ের কথা আছে, স্রোতের কথা আছে, তীর বেগে জাহাজ ছুটে চলার কথা আছে। এগুলো সবই সমুদ্র বিষয়ক ফররু খের কল্পনা। এই কল্পনার সুন্দর একটি বর্ণনা 'সিন্দাবাদ'কবিতায় এসেছে-

"রাত জেগে শুনি খোদার আলমে বিচিত্র কল্লোল
তারা ছিটে পরে মধ্যসাগরে জাহাজ জাগায় দোল,
আমরা নাবিক জঙ্গী জোয়ান ইশারা পেয়েছি কত
মউজের মুখে তাই ভেসে যায় টুকরো খড়ের মত।
বজ্র আওয়াজ থামায়ে গভীরে দরিয়ায় উঠে চাঁদ
দিলের দুয়ারে মাথা ঠুকে মরে নাবিক সিন্দবাদ।"

'বার দরিয়া' কবিতার শুরু তেই সমুদ্রের বর্ণনা থাকে। যেমন-

"সমুদ্র থেকে সমুদ্র ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী

খুরের হালকা, ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে
সমুদ্র থেকে সমুদ্র ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী
কেশর ফোলানো পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ,
তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারা রাত,
তাজী ছুটে চলে দুরন্ত গতি দুর্বার উচ্ছল,
সারা রাত ভরি তোলপাড় করি দরিয়ার নোনাজল।

'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতায় সমুদ্রের আরেকটি পরিচয় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এ সমস্ত বর্ণনা সবই এক রকম। অনেকটা পুনরু ক্তির মতো।

ফররু খ আহমদ সমুদ্র যাত্রায় সিন্দবাদকে সাক্ষী মেনেছেন। আরব্য উপন্যাসে যে সিন্দবাদের বিবরণ পাই, সে ছিল ব্যবসায়ী। সে সমুদ্রপথে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেত। এইভাবে যাত্রাপথে অনেক দ্বীপাঞ্চলে তাকে নামতে হয়েছে এবং সে দ্বীপে সে অনেক বৃক্ষ দেখেছে এবং অনেক আশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। ফররু খ আহমদ তার সমুদ্রের বর্ণনায় প্রায়ই দ্বীপের কথা বলেছে। বন্দরের কথাও বলেছে। এগুলো সবই সিন্দবাদের অনুষঙ্গি। অনেক সময় মনে হয়, ফররু খ ঠিক সমুদ্রের বর্ণনা করছে না। সে বারে বারেই মাটিতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছে। সিন্দবাদ কবিতাটি এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিন্দবাদ কখনও পিপুল বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আবার কখনও নারিকেল শাকের হাওয়া এসে তাঁর গায়ে লাগছে। এই নারিকেল শাখের কথা 'বার দারিয়া'র কবিতাটিতেও আছে। আবার 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতাটিতে নতুন দ্বীপের পত্তনের কথা আছে। এভাবেই আমরা লক্ষ্য করি যে, সিন্দবাদের চোখে রয়েছে দ্বীপাঞ্জলের মোহ। সে অনবরত দ্বীপ খুঁজছে এবং আশ্রয় খুঁজছে। যেহেতু সে বণিক সুতরাং পণ্য বিক্রির জন্য তাকে পোতাশ্রয় খুঁজতেই হবে অথবা মৃত্তিকা অঞ্চল খুঁজতেই হবে।

ফররু খ আহমদ সমুদ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঢেউয়ের বর্ণনা এনেছে বারবার। ঢেউ কখনও অর্শ্বের মত ছুটে চলে, কখনও অজগরের মত সামনে এগিয়ে চলে। তাঁর সম্পূর্ণ বর্ণনাটা কাল্পনিক কিন্তু বিস্ময়ের কথা হচ্ছে যে, কল্পনার অধিক গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি একটি আশ্চর্য সাবলীল গতি মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেছেন। যখন এই কবিতাগুলো ফররু খ লিখেছিলো সেই সময় সে পাঠ করতো দোভাষীর পুঁথি হাতেম তাঈ, গোলেবাকাওলি এবং আলিফ লায়লা। ফররু খের হাতে দোভাষীর পুস্তি কাটি আশ্চর্য সজীবতা পেয়েছে। সমুদ্রের যে কাল্পনিক চিত্র সে নির্মাণ করেছে, তাতে আমরা অভিভূত হই।

যেহেতু ফররু খ সিন্দবাদকে তার নায়ক করেছে সুতরাং সিন্দবাদের জন্য আশ্রয় সন্ধান করা সে কর্তব্য মনে করেছে। সিন্দবাদ তাঁর সফরে সমুদ্রস্রোত অতিক্রম করে নতুন বন্দর অথবা নতুন অবস্থানের সন্ধান করেছেন। সেই কারণে ফররু খ বারবার নোনা দরিয়ার কথা বললেও বিভিন্ন দ্বীপের কথাও তাকে বলতে হয়েছে। বনাঞ্চলের কথা বলতে হয়েছে এবং সফলকাম অবস্থানের কথা বলতে

হয়েছে। 'সাত সাগরের মাঝি'র প্রথম কবিতা সিন্দবাদ। কবিতাটি সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থের মূল সুরটি আমাদের ধরিয়ে দেয়। যেহেতু সিন্দবাদ একজন বণিক সুতরাং সমুদ্র পথে গিয়ে বারবার জাহাজ বন্দরে এসে থেমেছে। এই চিন্ত া তাকে করতেই হচ্ছে। ফররু খের বর্ণনাটি মহাসমুদ্রের নয়। যে সমুদ্রের কোন দিগন্ত নেই এবং যে সমুদ্র শুধুই অনন্ত পথে সম্মুখ যাত্রী। ফররু খ সিন্ধু ঈগলের কথা বলেছে কিন্তু সিন্ধু ঈগল দেখা যাবে বন্দরের কাছে। মহাসমুদ্রের কাছে নয়। তাঁর 'বার দরিয়া' কবিতাটিতে ফররু খের কল্পনায় সমুদ্রের একটা পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। সে জাহাজকে বলেছে, জাহাজকে অর্শ্বের সাথে তুলনা করেছে। মৃত্তিকা প্রান্ত রে অর্শ্ব যেমন তীব্র বেগে ছুটে চলে, তেমনি আরব্য পথে সেই অর্শ্বের মত তীব্র বেগে সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ছুটে জাহাজের পালে যখন হাওয়া লাগে তখন সেই অবস্থাকে সে তুলনা করেছে অর্শ্বের কেশর ফুলানোর সঙ্গে। সে এই জাহাজের কথা বলেছে যে, এই জাহাজের গতি হচ্ছে দুরন্ত , দুর্বার ও উচ্ছল।

অন্য একটি কবিতার নাম 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি'। এই কবিতাটি সিন্দবাদকে ঘিরে লিখিত। মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি কাহিনীর আমেজ উপস্থিত করা। এই কাহিনীর আমেজের মধ্যে সমুদ্রের ঝড়ের একটি বর্ণনা আছে। এখানেও ঝড়ের র্বণনার মধ্য দিয়ে মৃত্তিকার প্রতি আকর্ষণ ব্যক্ত হয়েছে। মাল্লারা ঝড়ের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে সমুদ্র থেকে দেশে ফিরে যাবার প্রস্ত াব করছে। তার উত্তরে সিন্দবাদ বলেছেন যে, দেশে তিনি ফিরবেন না। তিনি সমুদ্রের আমন্ত্রণে সম্মুখে ছুটে চলেছেন এবং তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হয়। তুফানের মাতামাতি থাকতে পারে কিন্তু সফরের যাত্রা বন্ধ করা যায় না। মাল্লারা বারবার যদিও মাটির গভীর টানের কথা বলছে এবং বন্দরের চিন্ত া করে ক্রন্দনরত হচ্ছে কিন্তু সিন্দবাদ তাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করছেন। অন্য একটি কবিতার নাম 'হে নিশান বাহী'। কবিতার শেষ স্ত বকে কবি বলেছেন-

এখন তোমার দৃষ্টিতে জাগে সমুদ্রের ইঙ্গিত
সমুদ্র পথ আবিষ্কারের বিপুল সম্ভাবনা,
নিমেষে আকাশ পার হয়ে এসে বসুধার সঙ্গীত
শুনিবার সাধ এখনো তোমার যায়নি অন্যমনা।
তুমি বেঁচে আছো, আজো বেঁচে আছো- সেনানীর তরবারী,
আধো চাঁদ আজো সঙ্গী তোমার হে আল হেলালধারী।
তোমার তনুতে অনুতে অনুতে সেই অশ্রু সুর,.
জাগ্রত মানবাত্মা হেরিছে সমুদ্র অশ্রু র।
আছে তার পার; সাগর বেলার তীরে ভয় পেয়ো নাকো।
আধো চাঁদ আঁকা হে নিশানধারী এ মিনতি মোর রাখো-
যেথা আবর্ত-সঙ্কুল স্রোত বাধা কুটিল।

কবি 'আওলাদ' কবিতায় আবার সিন্দবাদকে নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ সিন্দবাদ বহু সামুদ্রিক পীড়া অতিক্রম করে, অনেক ক্ষুধিত রাত্রি পেছনে ফেলে এবং অন্ধকারে দিকভ্রষ্ট হয়ে নিরাশার অতলে নেমে যাচ্ছে যখন তখন সে আবার সাহস নিয়ে জেগে উঠছে এবং বহু ঝড় পার হয়ে সে বিজয়ী হচ্ছে। সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থে সর্বশেষ কবিতাটির নাম 'সাত সাগরের মাঝি'। এই কবিতার মধ্যে কবি মূলত সিন্দবাদের কথাই বলেছেন, তবে এখানে সরাসরি তার উল্লেখ নেই। তবে সিন্দবাদকে নিয়েই এই কবিতাটি। তার প্রমাণ হচ্ছে তিনি বলছেন-

'ভুলেছ কি সেই প্রথম সফর জাহাজ চলেছে ভেসে
অজানা ফুলের দেশে
ভুলেছ কি সেই জামরু দ- তোলা স্বপ্ন সবার
চোখে ঝলসে চন্দ্রালোকে,
পাল তুলে কোথা জাহাজ চলেছে
কেটে কেটে নোনা পানি;
অশ্রান্ত সন্ধানী
দিগন্ত নীল পর্দা ফেলে সে ছিঁড়ে
সাত সাগরের নোনা পানি চিরে চিরে।'

আরব্য উপন্যাসে উপাখ্যানগুলোর মধ্যে সিন্দবাদের উপাখ্যানটি অপূর্ব সাহসিকতার একটি অনবদ্য উপাখ্যান। সিন্দবাদ একজন ব্যবসায়ী। সে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলেছে ব্যবসায়ের মাধ্যমে। সে সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বন্দর থেকে বন্দরে গিয়েছে। কখনও ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছে, কখনও মৃত্যু বিভীষিকার মুখোমুখি হয়েছে। তাঁর বিপদের অন্ত ছিল না কিন্তু সে কখনও অসহায় এবং নিরাশ্রয়বোধ করেনি। সে বারবার চেষ্টা করেছে নতুন করে সাহস এনে আবার নতুন বন্দুরে যাত্রা করবার। ফররু খ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' মূলত সিন্দবাদেরই কাহিনী। দোভাষী পুঁথিতে 'আলিফ লায়লা'র কাহিনী পাওয়া যায়। এই দোভাষীর পুঁথিই ফররু খ আহমদের অবলম্বন ছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ফররু খ আহমদ একটি সচেতন ব্যঞ্জনায় আধুনিক কিছু রোমান্টিক কবিতা লিখেছিলেন। মূলত দোভাষীর পুঁথি কাহিনীকে তিনি অনুনির্মাণ করেননি বরঞ্চ পুঁথির রসাবেশে নতুন বিবেচনায় আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের রেশ 'সিরাজাম মুনীরা'য় আমরা পাই। সিরাজাম মুনীরার প্রথম কবিতাটিতে কবি বলছেন-

'কত অজ্ঞতা সাগরে সহসা ভেসে ওঠে কত সোনার দ্বীপ,
ভাষা মুখরিত তোমার পাখায় সব সাগরের অশ্রু জল।'

সিন্দবাদের কথাও এসেছে এই অধ্যায়ে। যেমন-

'অমনি অন্ধকূপমন্ডুক সাত সাগরের সিন্দবাদ
নোনাপানি চিরে দ্বীপে বন্দরে নুতন দিনের করে আবাদ,

সাগরে সাগরে নীল স্রোত চিরে ওঠায় ফসল মারজানে,
পাখা মেলে কোথা আকাশ নাবিক মুসাফির দূর বন্দরে।'

সাগরের উন্মাদনার কথা, ঝড়ের কথা এবং বিপদসংকুল দরিয়ার পথে যাত্রার কথা 'হাতেম তায়ী' কাব্যগ্রন্থেও আছে। দেখা যাচ্ছে কবি সিন্দবাদের জীবন কাহিনীকে ভুলতে পারছেন না। প্রথম কাব্যগ্রন্থে সমুদ্র যাত্রার কথা যেভাবে এসেছে তারই পুনরাবৃত্তি কখনও কখনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে হাতেম তায়ী'তে এসেছে। কবি তাঁর কল্পনার যে জগৎ অর্থাৎ সমুদ্র যাত্রার যে জগৎ সেই জগতকে কখনও ভুলতে পারেননি। একটি শোভমান প্রত্যয়ে বারবার তা আমাদের কাছে ফিরে আসছে। এ কারণে 'সাত সাগরের মাঝি'কে আমাদের বিশেষ গুরু ত্ব দিতে হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি একদিকে যেমন কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তেমনি কবির সামগ্রিক কাব্য সাধনায় বিশ্বাস এবং অভিরু চির দিকনির্দেশনা এই কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। কবি 'সাত সাগরের মাঝি'তে যে কথা বলতে চেয়েছেন, সে কথা তাঁর কাব্যগ্রন্থের মূল তৃষ্ণা। অন্ধকারের পরে সকাল যখন হল তখন নারঙ্গি বনে সবুজ পাতারা কাঁপছিল। নাবিকের কাছে সাত সাগরের আহবান এসেছে। তাঁকে দূর সমুদ্র যাত্রায় যেতে হবে মূল্যবান উপঢৌকনের সন্ধানে। সিন্দবাদ কখনও নিজের গৃহে বসে সময় কাটাতে পারে না। সে হচ্ছে দুর্গম সমুদ্র যাত্রার প্রতীক। যে কিস্তি নোঙ্গর করে আছে তাকে আবার দারিয়ায় সচল করতে হবে। কবি নাবিকদের উদ্বুদ্ধ করছেন এ কথা বলে যে, বেসাতি আনতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নাবিকরা গিয়েছে। সে সমস্ত বেসাতি সুগন্ধি এবং আনন্দ তাদের জন্য আবার এসেছে। আবার তাদেরকে নৌকা ভাসাতে হবে। সিন্দবাদের জীবনের মধ্যে শুধুই চলা যেমন ছিল, সেই চলার প্রতীক নিয়ে বারবার যাত্রা শুরু করার কথা কবি বলছেন। তাই এ কাব্যগ্রন্থটি মানুষের জন্য অসীম সাহসিকতার স্ফুরণ ঘটায়।

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০০]

ফররুখ আহমদের সিরাজাম মুনীরা

ফররু খ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে ঢাকায়। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো অনেক আগেই লেখা হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'সাত সাগরের মাছি'র পরে। তবে 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাগুলো যে সময়, যে বছরগুলোতে লেখা হয়েছে অথবা যে মাসগুলোতে লেখা হয়েছে, 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাগুলো তার পরে লেখা হয়েছে। কিন্তু সবই ১৯৪৬-১৯৪৭ এর মধ্যে।

কলকাতায় থাকতে ফররু খ মহানবীর জীবনী নিয়ে কবিতা লেখার কথা আমাকে বলেছিল। মনে আছে, সে একটি পরিকল্পনার কথা বলেছিল। সেটি নিম্নরূপ :

মহানবীর জন্ম যখন হল তখন একই সময়ে ইরানের অগ্নিপূজকদের শাশ্বত অগ্নি নির্বাপিত হয়েছিল এবং জামসিদের পানপাত্র ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফেরেস্ত াদের মধ্যে উল্লাস জেগেছিল যে, একজন মহান পুরু ষের আবির্ভাব ঘটেছে। এসমস্ত ঘটনা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে সে একটি বৃহৎ কবিতা লিখবে, এ পরিকল্পনার কথা সে আমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু এ পরিকল্পনা সে ঠিক রাখতে পারেনি। নতুন পরিকল্পনায় আমরা দেখি যে, 'সিরাজাম মুনীরা' নাম কবিতার সঙ্গে খোলাফায়ে রাশেদীনদের নিয়েও তিনি কয়েকটি কবিতা এ গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন এবং কাব্যগ্রন্থের শেষে আরো অনেকগুলো কবিতা যোগ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে 'শহীদে কারবালা', 'মন' 'আজ' 'খাজা নকস্‌বন্দ', 'মুজাদ্দিদে আলফেসানি', 'মৃত্যু সংকট', 'অভিযাত্রিকের প্রার্থনা', 'মুক্তধারা' এবং 'ইশারা'। ভাবের দিক থেকে মিল আছে ভেবে ফররু খ এ কবিতাগুলো এ গ্রন্থের সঙ্গে যোগ করেছিলেন।

'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশিত হবার পর অনেকেই বলেছিলেন যে, এ গ্রন্থটি কবির কাব্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। কথাটি ঠিক নয়। কেননা 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে 'হেরার রাজ-তোরণে'র কথা আছে। 'চন্দ্র-খচিত নিশানে'র কথা আছে এবং মূলতঃ দুর্গম পথের শেষে ইসলামের আলোকিত লাবণ্যের কথা আছে। সুতরাং 'সিরাজাম মুনীরা' মূলত এই ধারার গ্রন্থ। শুধু মাত্র তফাৎ এখানে যে, রাসূলের নিকট পৌঁছবার জন্য যে যাত্রাপথ সে যাত্রাপথের বিবরণ 'সাত সাগরের মাঝি'তে আছে এবং সব কিছু প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থে একটি সুস্পষ্ট এবং পরিশীলিত কল্যাণধর্মী জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তবে এ গ্রন্থের কিছু কবিতায় কিছু সুফী সাধকের কথা এসেছে। যেগুলো 'সিরাজাম মুনীরা' অথবা খোলাফায়ে রাশেদীনের কবিতাগুলোর সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। আগের কবিতাগুলোর মধ্যে যে

সৌন্দর্য্য-অন্বেষা এবং আত্ম-উপলব্ধির কথা যেভাবে আছে শেষের কবিতাগুলোর মধ্যে সেভাবে নেই। যদিও ফররু খ সুফী তত্ত্বগত মোরাকিবার কথা 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতাটিতে কয়েকবার এনেছেন। যে অর্থে মওলানা রু মীর মসনবি, মানবাত্মার উৎস সন্ধানের কথা বলে অথবা ইকবালের আশরারে খুদী আত্মানুসন্ধানের কথা বলে সে অর্থে 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাগুলো একটু ভিন্ন ধরনের। 'সিরাজাম মুনীরা'য় কবিতাটির সর্বশেষ স্ত বক এ বিশিষ্টতার পরিচয় বহন করে।

সুর্মা গভীর আকাশের চোখে অশ্রু সজল বৃষ্টিধারা,
নতুন তারার পথ চেয়ে চেয়ে নীহারিকা হল দৃষ্টিহারা।
বিরাট প্রসার মহা-পটভূমি তোমার বেলায় ইতস্ত ত
অশেষ সম্ভাবনার পলিতে দুরন্ত মরু ঝড়ের মত
যারা এঁকে আসে নতুন মাটিতে সুদৃঢ় ছাপ পথ চলার
দীপ্ত ছুরিতে ভাঁজ কেটে কেটে অসাড় তিমির স্থবিরতার,
তাদের সঙ্গে সালাম জানায় হে মানবতার শাহানশাহ!
হে নবী! সালাম ঃ সালাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলুলাহ।

'সিরাজাম মুনীরা'র প্রথম কবিতা 'সিরাজাম মুনীরা– মোহাম্মদ মোস্ত ফা" যে ছন্দ ভঙ্গিতে রচিত সেটি 'সাত সাগরের মাঝি'র 'সিন্দবাদ' কবিতার অনুরূপ। যেমন– 'সিন্দবাদ' কবিতার নিম্নলিখিত কয়েকটি চরণ :

আর থেকে থেকে দমকা বাতাসে নারকেল শাখে হাওয়া
ভোলায়েছে সব পেরেশানি, শুরু হয়েছে গজল গাওয়া,
সুরাত জামাল জওয়ানির ঠোঁটে কেটেছে স্বপ্নরাত
শুনেছি নেশার ঘোর কেটে যেতে এসেছে নয়া প্রভাত।

এর সঙ্গে সুব মিলিয়ে পড়া যায় 'সিরাজাম মুনীরা'র প্রথম কবিতার এ কয়টি চরণ :

ঐ আসে আসে সেই বিহঙ্গ সাতরঙ্গা তার শ্বেত পাখায়,
আকাশের বুক ঘন হয়ে ওঠে নীল মরকত স্বচ্ছতায়,
সোনালী আলোয় শ্বাপদ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে;
থির বিদ্যুৎ আভা তরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে।

এরকম আরো মিল অনেক আছে। 'সাত সাগরের মাঝি'তে যে আবেগ এবং আবেশ 'সিরাজাম মুনীরা'য়ও তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. কত অজ্ঞাত সাগরে সহসা ভেসে ওঠে কত সোনার দ্বীপ,
ভাষা মুখরিত তোমার পাখায় সব সাগরের অশ্রু জল,

২. সে মাটি পেয়েছে দরাজ বাজুতে আকাশ পারের প্রবল ঝড়
পার হয়ে যায় মরু সাইমুম তীব্রচ্ছটা ভয়ঙ্কর,
রাত্রি মুগ্ধ বেষ্টনী হতে ছিটে পড়ে তারা নীহারিকার,
সকল আকাশ ধরা দেয় এসে বিপুল সবল মুঠিতে তার।

৩. অমনি অন্ধ কূপমণ্ডুক সাত সাগরের সিন্দবাদ
নোনাপানি চিরে দ্বীপে বন্দরে নতুন দিনের করে আবাদ,
সাগরে সাগরে নীল স্রোত চিরে ওঠায় ফসল মারজানের,
পাখা মেলে কোথা আকাশ-নাবিক মুসাফির দূর বন্দরের।

রসুলে খোদার জীবন বৃত্তান্তে র পরিবেশগত দিক হল এই যে, তিনি মরু ভূমির উষর ভূমির মানুষ ছিলেন। মরু ভূমির পরিবেশ এ কবিতায় এসেছে কিন্তু সমুদ্রের পরিবেশও এসেছে। লেখক "সাত সাগরের মাঝি"র আবেগ এবং আশ্বাসকে ভুলতে পারেন নি। একই চিন্ত া-প্রবাহ 'সিরাজাম মুনীরা'য় কাজ করছে। 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতাটি অত্যন্ত সুন্দর এবং আবেগময় কবিতা। কিন্তু মহানবীর আদর্শের রূপায়ণ মরু ভূমির জীবনে যেভাবে ঘটেছিল তার চিত্র এ কবিতাতে তিনি দেননি। মূলত ফররু খ ভাবরসিক এবং রোমান্টিক কবি।

যে ছন্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। প্রতিটি চরণ ছয়মাত্রার চালে বিন্যস্ত এবং চরণের শেষের পর্বটি পাঁচ মাত্রার। এই বিন্যাসটি সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। 'আবু বকর সিদ্দিক' কবিতায় কখনও কখনও চরণের শেষ খণ্ড পর্বটি পূর্ণ ছয় মাত্রার পর্বে পরিণত হয়েছে। যার ফলে একটি অস্বস্তি কর দোলা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :

লু হাওয়ায় যদি আহিগ্‌জর শাখা দোলে
ভ্রান্তি তে যদি পথনির্দেশ পুনরায় কেউ ভোলে,
তখন দোলাও সবুজ পতাকা দোলাও
আল হেলালের পতাকা তোমার দোলাও।

যেমন ফররু খ লিখেছেন :

তবে সে মদীনা আকাশে আকাশে দোলাও,
মরু খর্জুর শীর্ষে শান্তি -শ্রভ্র পতাকা দোলাও,
সৌম্য বৃদ্ধ মহা পারাবার অতল প্রশান্তি র
চির বিশ্বাসী হে সর্বত্যাগী সঙ্গী দুখ রাতির
বন্ধু পরম! শান্তি পতাকা দোলাও
মদীনা আকাশে দোলাও।

আর একটা মিল নিম্নরূপ :

বাতাসে বাতাসে খেজুর পাতারা তোলে শুধু মর্মর
আলোর দোলায় কেঁপে ওঠে অম্বর,

২. পরম সত্য বেদনা-বিদ্ধ তার বুজে ওঠে
দূর যাত্রীর স্বর
স্ত দ্ধ নিথর কোটি তারা ভরা গভীর নিশীথে
মরু রাত্রির স্বর
আলাহু আকবর
আলাহু আকবর॥

'আবু বকর সিদ্দিক' কবিতাটি একই ছন্দ-স্পন্দের পর্ব বিন্যাসে সাজানো নয়। যার ফলে বিভিন্ন চরণে অব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সাত সাগরের মাঝি' ছন্দ বিন্যাসে যে রকম নিটোল এবং হিল্লোলিত, 'আবু বকর সিদ্দিক' কবিতার ছন্দটি সে রকম নয়। বিশেষ করে কোনো কোনো চরণের শেষে ছয় মাত্রার একটি পূর্ণ পর্ব ছন্দের গতিকে ব্যাহত করেছে। যেমন–

মরু শর্বরী পাড়ি দিয়ে বহু রাত্রি দেখেছো আদম সূরাত
দেখেনি সে আর দরদী সাথীর ধ্যান গম্ভীর রওশন রাত।

'সাত সাগরের মাঝি'তে ফররু খ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারটি সুন্দরভাবে করেছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিশিষ্টতা হচ্ছে প্রতিটি চরণ পর্বগত বিন্যাসে সাজানো। সমমাত্রার কয়েকটি পর্বের পর চরণের শেষে একটি খণ্ড পর্ব এসে ছন্দের দোলাটাকে বাঁধা দেয়। শেষ খণ্ড পর্বটি পূর্ণপর্ব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাধারণত এ খণ্ড পর্বটি অন্যান্য পর্বের চাইতে মাত্রার দিক থেকে কম হয়। মোহিতলাল মজুমদার এ মাত্রা ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পর্ব বিভাগগুলো হচ্ছে- পর পর তিনটি ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং চরণান্তে র শেষ পর্বটি পাঁচ মাত্রার। অন্যান্য পর্বগুলো ছয় মাত্রা করে। ফররু খের মধ্যে এ ব্যাপারটা দেখা যায়।

ইসলামের ইতিহাসে রসূলে খোদা এবং খোলাফায়ে রাশেদীন একটি বিস্ময়কর সত্যবোধের সূচনা। জগতে যত মানুষ এসেছেন এবং তাঁদের যত প্রত্যয় এবং বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক যুগের যারা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। তাঁরা মানুষকে সত্যের দীক্ষা দিয়েছেন। বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং জীবনের জন্য একটি প্রত্যয় নির্মাণ করেছেন। শুধু এ কারণেই তাঁদের জীবন কাহিনী আমাদের জানার প্রয়োজন আছে। রসূলে খোদাকে আমরা অনুভব করতে পারিনা তিনি আলাহর বন্ধু হিসাবে এবং অহিপ্রাপ্ত পুরু ষ হিসাবে একজন অনন্যসাধারণ অস্তি ত্ব ছিলেন। তাঁকে অনুভব করতে হয় ধ্যানে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে তাঁর অনুপম প্রাপ্তি পরিণত হয়। ফররু খের কবিতায় এই অনুপম প্রাপ্তির কথা আছে।

'সিরাজাম মুনীরা' ফররু খ আহমদের একটি মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ। ফররু খ একাডেমী এ কাব্যটি পুনঃমুদ্রণ করে একটি ভাল কাজ করলো। এ জন্যে একাডেমীর সকলে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

(ভূমিকা 'সিরাজাম মুনীরা', ফররুখ একাডেমী সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০০)

ফররুখ আহমদ-এর 'হাতেম তায়ী'

এক সময় মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহে পুঁথি পাঠ করা হত। পুঁথি পাঠ করা হত কাহিনীর জন্য, রূপকের জন্য, অলৌককতার জন্য এবং অবাস্ত ব কাহিনী মাধুর্যের জন্য। এ সব কারণে পুঁথি পাঠ করতেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, তাঁর গৃহে প্রবীণরা মুসলমানদের পুঁথি পাঠ করে আনন্দ পেতেন। এগুলো বাস্ত ব কাহিনী ছিল না। এগুলো অবাস্ত ব লালিত্যে গঠিত হত। অধিকাংশ ছিল প্রেমের কাহিনী এবং সেই প্রেমের কাহিনীর মধ্যে পরীদের গল্প থাকতো, জ্বীনদের তাৎপর্যময় আচরণ থাকতো। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সকল মানুষ এগুলো পাঠে আনন্দ পেত। এ পুঁথিতে জীবনচর্চা থাকতো না, বাস্ত ব মানুষের আনাগোনা থাকতো না, এগুলোতে অবিশ্বাস্য কাহিনী মানুষের চিত্তে আনন্দ দিত। বাংলাদেশে একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশে ইংরেজি চর্চা আরম্ভ হয়নি। সেকালেই পুঁথিগুলো পাঠ হত। ইংরেজি চর্চার ফলে আমাদের দেশে জীবনে নৈপুণ্য এসেছে, বাস্ত ব মানুষের প্রেম-ভালবাসার কাহিনী এসেছে এবং প্রখর বাস্ত বতার ইঙ্গিত এসেছে। কিন্তু পুঁথির কাহিনী এরকম ছিলনা। তাতে অবাস্ত বতার ইঙ্গিত ছিল, আনন্দ ছিল এবং উচ্ছ্বাস ছিল, এগুলো পাঠ করে মানুষের আনন্দ জাগতো। কিন্তু এগুলোকে তারা বিশ্বাস করতো না। এসব পুঁথির অবাস্ত বতা মানুষের মনে একটি মাধুর্য সৃষ্টি করতো। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে এগুলো প্রচলিত হয়। উর্দুতে দাস্ত ান শ্রেণীর কাহিনী কাব্য ছিল। বাংলা পুঁথির মূলে এই দাস্ত ানের কাহিনীগুলো কাজ করেছে। গুলে বাকাউলি, শিরি-ফরহাদ, হাতেম তা'য়ী, আমির হামযা ইত্যাদি কাহিনী দাস্ত ানের অন্ত র্ভুক্ত ছিল। এই দাস্ত ানই পুঁথির উৎস। পুঁথিকারগণ দাস্ত ান থেকে গল্প নিয়েছেন, কিন্তু হুবহু দাস্ত ানকে অনুকরণ করেননি। মৌল কাহিনীটি দাস্ত ান থেকে এসেছে, কিন্তু বাংলায় তা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজ আগমনের সময় এগুলোর চল ছিল। মূলত বলা যেতে পারে, আমাদের ভাষায় উপন্যাস ও ছোটগল্পের আগমনের পূর্বে এই পুঁথি-কাহিনীগুলো সে স্থান পূর্ণ করেছিল। মানুষের জীবনে তখন কর্মের জটিলতা ছিল না, অবসর ছিল প্রচুর। এই অবসরের সময় চিত্তের প্রসাদের জন্য মানুষ পুঁথি বা দাস্ত ানের দ্বারস্থ হত। আমাদের পূর্ব প্রজন্ম যাঁরা, তাঁরা পুঁথি পাঠ করতেন এবং আনন্দ পেতেন। বাস্ত ব ঘটনার নিরিখে পুঁথি পাঠকদের আকর্ষণ করতো। যখন পুঁথির প্রচলন ছিল তখন মানুষের জীবন স্বচ্ছল ছিল, বিরোধ-বিসংবাদ কম ছিল এবং পুঁথি তাদের আনন্দের উপঢৌকন হিসেবে এসেছিল। যেভাবে পুঁথি পাঠ করা হত তার একটি কৌশল ছিল। একজন বয়স্ক লোক সুর করে পুঁথি পাঠ করতেন এবং শ্রোতারা

বিপুল আনন্দে তা শ্রবণ করতেন। আমার মনে আছে আমার মায়ের মুখে আমি হাতেম তা'য়ী-এর গল্প শুনেছি। হুসনা বানুর সওয়াল এবং হুসনা বানুর বিভিন্ন কর্ম আমাদের অভিভূত করতো। পুঁথির ধারা এখন শেষ হয়ে গেছে। আগের দিনের পুঁথির পাঠকও নেই, তার শ্রোতাও নেই। আমার যৌবনকালে আমি পুঁথি পড়েছি এবং পুঁথি পড়া শুনেছি। এখন এই পরিণত বয়সে পুঁথির কাহিনী আমাকে আর আকর্ষণ করে না।

ফররু খ আহমদ গভীর মনোনিবেশ সহকারে পুঁথি পড়তো। দুটি পুঁথি সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতো। একটি কাসাসুল আম্বিয়া, অন্যটি হাতেম তা'য়ী । শুধু কাহিনীর জন্য সে পড়তো তা নয়, ঘটনাপ্রবাহ, কাহিনীর গঠন-প্রকৃতি এগুলো সে বুঝবার চেষ্টা করতো। সে আমাকে বলতো, "আলী, এইসব পুঁথির মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তা অন্য কোথাও পাওয়া যায়না। বাস্ত ব জীবনকে তারা গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু অন্য একটি জীবন তারা নির্মাণ করেছে, যার স্বাদ অফুরন্ত । ঘটনার বাস্ত বতা কিংবা কৃত্রিমতা কোন বড় কথা নয়, চিত্ত অপহরণ করার কথাই বড় কথা। বাস্ত ব তো এই আছে এই নেই, কিন্তু অবাস্ত বের রসাস্বাদ করতে পারলে আমরা প্রাত্যহিকতাকে অস্বীকার করতে পারে।"

হাতেম তা'য়ী-এর কথা ধরা যাক না কেন সে যথার্থ একজন মানুষ ছিল অবাস্ত ব কোন সত্তা নয়, কিন্তু তাকে ঘিরে অনেক অবাস্ত ব রহস্য তৈরী হয়েছে। মানবকল্যাণী একজন পুরু ষ হিসেবে সে মানুষের মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে এবং কর্ম সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তার ঐশ্বর্যের তুলনা ছিল না। কিন্তু ঐশ্বর্য সে নিজের জন্য ব্যয় করেনি। যারা তার দরজার কাছে এসেছে তাকেই সে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। দুঃস্থ মানুষের কল্যাণের জন্য সে সর্বস্ব ব্যয় করেছে। আগ্রহ ও অনুকম্পা থেকে তার শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। বিনয়ী, নির্বিরোধ, কামনাহীন এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হাতেম তা'য়ী একজন আদর্শ পুরু ষ ছিলেন। এ গ্রন্থের কাহিনী প্রবাহ জটিল আবর্তে আবর্তিত। মানুষের কল্যাণের জন্য হাতেম তা'য়ী দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছেন, অসৌজন্য তাকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু অসৌজন্য তাকে গ্রাস করতে পারেনি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে হাতেম তা'য়ী-র জীবনযাত্রা ছিল করু ণাপ্রবণ, বিরোধী শক্তির বিরু দ্ধে সহজাত বিদ্রোহ এবং অনুকম্পা ও করু ণায় সকলকে আপন করে নেয়া। সেজন্যই রাসূলে খোদার কাছে তাঁর কন্যাকে যখন বন্দী দশায় নিয়ে আসা হয় তখন তিনি যেই শুনলেন যে এই মহিলা হাতেম তা'য়ীর কন্যা তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে তাকে মুক্তি দিলেন। এই হাতেম তা'য়ীর কাহিনী ফররু খ পাঠ করতো, শুধু পাঠ করতোই না, এর বিভিন্ন ঘটনার তাৎপর্য সে অনুধাবন করবার চেষ্টা করতো। কাহিনীর মধ্যে অনেক রূপকের বিন্যাস আছে, অস্বাভাবিকতার মাধুর্য আছে এবং অলৌকিকতার তাৎপর্য আছে। ফররু খের সময় আমিও কিছু পুঁথি পড়েছি। চাহার দরবেশ-এর পুঁথি আমি পাঠ করে মুগ্ধ হই এবং সে কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে একটি কাব্য কাহিনী লিখি। আমাদের সময় কালের আরেকজন কবি আহসান হাবীব দোভাসী পুঁথির বাণী বিন্যাস গ্রহণ করে আধুনিক

কবিতায় তা প্রয়োগ করেছেন। আমাদের চেয়ে অনেক প্রাচীন এবং শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম শামসুদ্দীন পুঁথি সুর করে পড়তেন। এক সময় কবি কায়কোবাদকে দেখেছি পুঁথি পড়তে এবং পুঁথির কাহিনী উপভোগ করতে। এখন পুঁথি হারিয়ে গেছে। আমার পরে যারা এসেছেন এবং তারও পরে যারা আসছেন পুঁথির কাহিনীর মাধুর্য যে কি তা তারা জানেন না। আমিও যৌবনকালে পুঁথির কাহিনী উপভোগ করতাম। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক সাহিত্যের গ্রাসে পুঁথির কথা আমি ভুলে গিয়েছি। তবে এটা স্বীকার করি এককালে প্রেমের উপাখ্যানের লীলা বিলাসে পুঁথি মানুষের মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি করতো। তখন পুঁথিতে স্বপ্ন ছিল এবং সে স্বপ্ন আমাদের কাছে সত্য ছিল।

বর্তমানে পুঁথি আর গ্রাহ্য নয়, ইতিহাসের ধারায় এর একটি মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু শিক্ষিত সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে গেছে। তার কতকগুলো কারণ আছে। সেগুলো আমরা নিম্নরূপে চিহ্নিত করতে পারি।

১. বাংলা ভাষার বিবর্তন হয়েছে, যে বাংলা ভাষায় এক সময় আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দের মিশ্রণ ছিল সে ভাষা সংস্কৃতির সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। এখন মুলত বাংলা ভাষা তৎসম স্বভাবের। ইতিহাসের ধারায় আমরা পুঁথির ভাষাকে এক সময়ের ভাষা প্রবাহের নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু এখন তা নয়।

২. পুঁথির ছন্দ পয়ার ছন্দের প্রাচীন রূপ। পয়ার ছন্দের বিন্যাসের মধ্যে কখনও এটা দ্বিপদী, কখনও ত্রিপদী এবং সমগ্র ছন্দটি একই কাঠামোতে গড়া। তার ফলে কবিতা পাঠে একটি ক্লান্তি আসে। কবিতার সজীবতা নির্ভর করে বিচিত্র ছন্দের আবহে। কিন্তু তা না থাকার দরু ণ পুঁথির ছন্দরূপ ক্লান্তি দায়ক এবং উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

৩. পুঁথির কাহিনীতে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে দৈত্য-দানব এবং প্রবীণদের রূপকথা। বর্তমানে যেসব কাহিনী আমরা পাঠ করি সেগুলো আধুনিক জীবনের বাস্ত বতায় চিহ্নিত। সুতরাং আধুনিক জীবনে পুঁথির অনুপ্রবেশ একেবারেই অসম্ভব।

৪. পুঁথির কাহিনীতে যে আনন্দ এবং যে লালিত্যের সংক্রমণ সেগুলো শিক্ষিত মনকে আলোড়িত করে না। অনেকটা মধ্যযুগীয় পুঁথিতে আছে, কিন্তু আধুনিককালে সে রসাবেশের মূল্য নেই।

৫. আরব্য উপন্যাস যেমন বিভিন্ন কাহিনী একত্রে গ্রন্থিত হয়ে বিচিত্র কল্লোলের মত গতিধারা নির্মাণ করেছে পুঁথিতে তাই আমরা লক্ষ্য করি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হাতেম তায়ীর পুঁথি। হুস্নাবানুর সাতটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হাতেম তা'য়ী বিভিন্ন রূপকথার সম্মুখীন হয়েছেন। সে রূপকথায় কোথাও বিভীষিকা, কোথাও সমুদ্র তীরে একাকী অপেক্ষমান যাত্রী, কোথাও ধ্বংসের লীলা, কোথাও অগ্ন্যুৎপাত, কোথাও বনভূমিতে বিচরণকারী বন্যপশু এ সমস্ত কথা ও কাহিনী হাতেম তা'য়ী পুঁথিতে এসেছে। তাই আজকের দিনে পুঁথির কাহিনীর সাহস ও সংকল্প অনেকটা প্রহসনের মত।

কিন্তু পুঁথিকে অবলম্বন করে নতুন কাহিনী নির্মাণ করা যায়। তার আশ্চর্য নিদর্শন হচ্ছে ফররু খ আহমদের হাতেম তা'য়ী। এই বইটিতে পুঁথিকারদের উদ্দেশ্যে কবি একটি সনেট লিখেছেন। সনেটটি নিম্নরূপঃ

"কাহিনী শোনার সন্ধ্যা মিশে যায় দূরে ক্রমাগত
নাতেকা পাখীর মত রঙধনু দিগন্তে র পারে,
সহস্র সংশয় এসে হানা দেয় বক্ষে বারে বারে;
হাজার সওয়াল এসে তনু মন করে যে আহত।
যুগান্তে র ঘূর্ণাবর্তে বেড়ে যায় হৃদয়ের ক্ষত,
মেলে না সান্ত্বনা, শান্তি , বাদগর্দ হাম্মামের ধারে,
অজানা মুক্তির পথ রু দ্ধ এক রাত্রির দুয়ারে
খুঁজে ফেরে অন্ধকারে শতাব্দীর কাহিনী বিগত।
নির্বাক নিস্ময়ে দেখি বিস্মৃতি প্রাণের ব্যাকুলতা
সঞ্চারিত এ মাটিতে, এই পাক বাংলার প্রান্ত রে,
অথবা রাত্রির পটে জীবনের নব রূপকথা
পদ্মা মেঘনার দেশে বহমান ক্লান্তি র প্রহরে।
পুঁথির পৃষ্ঠায় ম্লান মানুষের আর্তি মানবতা
উজ্জ্বল হীরার মত দেখি জ্বলে রাত্রির প্রহরে।।

ফররু খ আহমদ পুঁথিকে কিন্তু অনুসরণ করেনি, না পুঁথির ভাষা না পুঁথির জীবনদর্শন। সে হাতেম তা'য়ীকে বেছে নিয়েছে প্রভাবান মানুষ হিসেবে যিনি সর্বদা উন্মুখ মানব সেবার জন্য। ফররু খ সেজন্য বলেছে ইয়েমেনের শাহাজাদা তা'য়ী পুত্র হাতেম পথের নির্দেশ পেয়েছিলেন আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে। হাতেম তা'য়ীর কাছে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সেবা করা, সত্যকে দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত করা এবং মুক্ত প্রজ্ঞার সন্ধান লাভ করা। ফররু খ বলছে এটাই হাতেম তা'য়ীর পরিচিত এবং বিশ্ব-রহস্যের মূলে এটাই চরম সত্য। সে হাতেম তা'য়ী গ্রন্থের পরিচিতি পর্বে হাতেম তা'য়ীর আত্মজিজ্ঞাসার স্ফুরণ ঘটিয়েছে। সে বলছে ঃ পৃথিবীতে বহু মনুষ্য আছে যারা হতাশাগ্রস্ত এবং দারিদ্র্যে নিপীড়িত। কল্যাণ কামনা করে হাতেম তা'য়ী তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর জিজ্ঞাসার মূলে সর্বদাই একটি প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নটি হচ্ছে দুর্গম পথে যাত্রা করতে হবে সৌজন্যের সন্ধানে এবং নিপীড়িত মানুষকে আশ্রয় দিতে হবে। ফররু খ আহমদ হাতেম তা'য়ীর প্রজ্ঞাবান চিত্ত এবং অহমিকাশূন্য মানব-প্রীতিকে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে :

বাঁধ মুক্ত দরিয়ার টানে
ক্ষীণ ঝর্ণাধারা, নদী ছুটে আসে আনন্দে যেমন
তেমনি দরাজ দিল হাতেমের সাখাওতি আর
সুরাত, হিম্মাৎ দেখে এল কাছে জনতা মজলুম
এল নির্যাতিত প্রাণ। কেননা যে বান্দা এলাহির,

ঈমানের দীপ্ত শিখা যার দিলে, মুহব্বত মনে
যার অবারিত দ্বার পৃথিবীতে প্রেমে ও সেবায়
পুরায় প্রার্থীর চাওয়া যে মুমিন এলাহির নামে;
জেগে ওঠে মনুষ্যত্ব তার তপ্ত জিগরের খুনে
আরক্তিম (অন্ধকার শেষে যেন আফতাব নূতন
জাগায় জাহান সারা অকৃপণ রশ্মি বিনিময়ে)!

হাতেমের পরিচয় সূত্রে ফররু খ যেসব কথা বলেছে এবং বিশেষণ শোভিত করেছে সেগুলো কিন্তু আধুনিক কবিতার ভাষা এবং ছন্দ। দোভাষী পুঁথির অঙ্গীকারের চিহ্নমাত্র এখানে নেই। ফররু খ দোভাসী পুঁথি এখানে পুনঃনির্মাণ করেনি, কিন্তু দোভাষী সৌজন্যে আধুনিক জীবনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সূচনা পর্বে হাতেম তা'য়ীর যে পরিচয় আমি পাই সে পরিচয় পুঁথিতে নেই। পুঁথিতে শুধু সংক্ষেপে আছে তিনি একজন সৌখীন এবং মানুষের কল্যাণে সর্বদাই নিয়োজিত। এ সত্যটা ফররু খ ব্যাপক আকারে প্রকাশ করেছে উপমার পর উপমা এনে এবং এগুলোর মধ্যে বিস্ময়কর সঙ্গতি রক্ষা করে ফররু খ যে হাতেম তা'য়ীকে নির্মাণ করেছে তিনি পুঁথির কাহিনীর হাতেম তা'য়ীর আবির্ভাব। প্রাচীন কাহিনীর জের আছে সন্দেহ নেই, প্রাচীন তথ্যও অনেক আছে, কিন্তু চরিত্র জ্ঞাপনের জন্য ফররু খ যে হাতেম তা'য়ীকে নির্মাণ করেছে সে আমাদের মানস-লোকের হাতেম তা'য়ী। অলৌকিকতা তার সামনে কিছু নয়, বন্য শ্বাপদ তার সঙ্গে কথা বলছে এটাও কোন বিস্ময়ের নয়। অতল সমুদ্রের কাছে যে হাতেম দাঁড়িয়ে আছেন সেটাও এমন কিছু নয়। এ সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে যে হাতেম আবিস্কৃত তিনি একজন সহজ, সরল পূণ্যবান পুরু ষ। অলৌকিক ঘটনার প্রবাহ তাকে অলৌকিক করেনি বরঞ্চ তাকে জীবনময় করেছে। সূচনা পর্বে ফররু খ একথাই বোঝাতে চেয়েছে যে হাতেম তা'য়ী একজন মানুষ, সুপুরু ষ এবং সুমহান তার অভিব্যক্তি। সে দুর্বল নয়, কিন্তু তার অহমিকাও নেই। দুর্দশাগস্ত মানুষের সামনে তিনি স্বততই দন্ডায়মান। ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের সামনে থেকে তিনি নিরীহ মানুষকে রক্ষা করেছেন, কিন্তু ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন নিজের শরীরের মাংস কেটে দিয়ে। এ কাহিনী রূপকচ্ছলে বলা, কিন্তু এর অভিপ্রায় স্পষ্ট। সকলের জন্য হাতেমের কল্যাণবহ সে মানুষ অথবা পশুই হোক। হাতেমের এই পরিচয় ফররু খ যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে তার তুলনা হয় না।

দোভাষী পুঁথিকার এর ধারে-কাছেও পৌঁছাতে পারেননি। ফররু খ খুব বিস্ত ারিত বর্ণনা করেছে সবকিছু। এই বিস্ত ারিত বর্ণনার মধ্যে মনোজগতের কথা, আত্মজিজ্ঞাসা এবং উপলব্ধিজনিত জিজ্ঞাসার কথা আছে। এগুলো কখনই পুঁথিতে থাকে না। পুঁথি ভাবের দিক থেকে নিস্ত রঙ্গ, কিন্তু কাহিনীর দিক থেকে অস্বাভাবিক। ফররু খ পুঁথির কাহিনীর অস্বাভাবিকতা বজায় রেখেছে, কিন্তু আদুনিক সময়ের চিন্ত া ও মনন প্রবল প্রশ্রয় পেয়েছে তার রচনায়। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। বৃদ্ধা ধাত্রী হুসনা বানুকে উপদেশ দিয়েছিল যে কোন পুরু ষকে বিনা সংজ্ঞায়

এবং বিনা জিজ্ঞাসায় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। সে হুসনা বানুকে সাতটি সওয়াল বলে দেয়। যে ব্যক্তি এই সাতটি সওয়ালের উত্তর এনে দিতে পারবে তাকেই যেন হুসনা বানু স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে। হুসনা বানুও তাই মেনে নিয়েছিল। বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে হুসনা বানুর কোন অনুভূতি ছিল না। কাহনীর ধারায় প্রশ্নগুলো এসেছে এবং মুনীর স্বামীর জন্য হাতেম তা'য়ী উত্তর খুঁজতে বেরিয়েছে দেশে-বিদেশে। ফররু খ এটাতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সে দেখিয়েছে যে প্রশ্নগুলো করছে তা নিয়ে তার মনে প্রতিক্রিয়া জাগছে। কেন সে প্রশ্নগুলো করবে এই জিজ্ঞাসাগুলো তার মনে উদয় হচ্ছে। হুসনা বানুর স্বগতোক্তি অধ্যায়ে ফররু খ এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছে। সেই দীর্ঘ বর্ণনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে হুসনা বানুর মানসলোকের উদ্‌ঘাটন। হুসনা বানু বলছে :

"প্রশ্ন, প্রশ্ন, শুধু, প্রশ্নের জটিল অন্ধকারে
বিভ্রান্ত এ মন ঘোরে ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির কিনারে,
পায় না সে পথ খুঁজে,
পায় না সে আলোর ইশারা;
অজ্ঞতার অন্ধকার ঝরোকায় ফোটে না সিতারা।
প্রশ্নের আবর্তে আজ আমার এ মন নিরাশ্রয়
আলোর সন্ধান করে, চায় পূর্ণ জ্ঞানের সঞ্চয়,
পৃথিবীর সাথে চায় পরিচিতি সান্নিধ্য আত্মার;
তবু সে পায় না সাত সওয়ালের জওয়াব আমার।
প্রতি রাত্রে ভাবি আমি পরিপূর্ণ জীবনের কথা ঃ
কি উপায়ে শেষ হবে অজ্ঞতার চরম ব্যর্থতা,
কোন্ পথে পাব খুঁজে জীবনের শান্তি ও সুষমা,
বুঝি না; -বিস্বাদ স্মৃতি ক্রমাগত মনে হয় জমা।"

মানস-চৈতন্যের পরিচয় দোভাষী পুঁথিতে একেবারেই ছিল না। পুঁথিকারগণ অলৌকিক এবং অবাস্ত ব ঘটনা দিয়ে কাহিনী নির্মাণ করেছেন এবং সরল মানুষের মনে সে কাহিনী আনন্দের সঞ্চার করেছে। পাঠকের মনের মধ্যে একেবারেই কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। পাঠক শুধু কাহিনীর গতিধারা অনুসরণ করেছে এবং মুহূর্তের জন্য কাহিনীর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করেনি। আধুনিক কালে কবি ও কবিতার পাঠক মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কবিকে পাঠক নির্মাণ করতে হল এবং পাঠকও কবির ধ্যান-ধ্যারণার সঙ্গে পরিচিত হলেন। দোভাষী পুঁথির ক্ষেত্রে তা ছিল না। সেখানে পাঠকের প্রজ্ঞা কাজ করেনি। সেখানে পাঠকের কৌতূহল কাজ করেছে। ফররু খ আহমদ পাঠকের সজাগ অনুভূতি, তাৎপর্য বোধ এবং প্রজ্ঞাগত জিজ্ঞাসাকে ব্যাপক আকারে ব্যবহার করেছেন। হাতেম তা'য়ী সে অর্থে একটি আধুনিক কাব্য-কাহিনী। আধুনিক মানুষের চিন্ত া, ব্যাকুলতা এবং আগ্রহকে তিনি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। আধুনিক মানুষ নির্বিকার নয়। সে শুধুমাত্র কথকতায় সন্তুষ্ট নয়। সে

মানুষের মনের নিভৃত কক্ষে যেতে চায়। ফররু খ এই নিভৃত কক্ষের দরজা উন্মোচন করেছে। সে এক জায়গায় বলেছে :

"প্রাণের পেয়ালা তুমি পূর্ণ করো কানায় কানায়
ওগো সাকী! যে বিহঙ্গ ওড়ে আজ উন্মুক্ত ডানায়
নতুন প্রেরণা দাও সঞ্জীবিত করো তুমি তাকে
জীবন-মৃত্যুর মাঝে মহত্তর জিন্দেগীর ডাকে,
উদ্দাম ঝড়ের মুখে করো তাকে সংকাহীন, আর
জুলমাতের এলাকায় করো তাকে পূর্ণাঙ্গ সত্তার
অধিকারী। করো রক্ষা প্রসারিত প্রেমে ও প্রজ্ঞায়,
নূহের উজ্জ্বল দৃষ্টি দাও তাকে ঘূর্ণি ও বন্যায়,
অনাবাদী জমিনের বালু-বক্ষে ফলাতে ফসল
খিজিরের প্রাণৈশ্বর্য দাও তুমি ... সবুজ ... শ্যামল,
প্রশ্নের জটিল গ্রন্থি উন্মোচিত হয় যাতে; আর
তৃষিত মানসে যেন খোলে দ্বার প্রশান্তি -প্রজ্ঞার।"

হাতেম তা'য়ীর কাহিনী বিন্যাস অপূর্ব। সে কাহিনী বিন্যাসকে আধুনিক চিন্ত া ও মানসের কাছে ফররু খ নিয়ে এসেছে। আধুনিক মানুষও এ কাহিনীটি উদগ্রীব হয়ে পাঠ করে। কবিতার ভাষা শ্লথ নয় এবং আড়ষ্টও নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মৌল কাঠামোতে ফররু খ এ কবিতা রচনা করেছে। প্রথম প্রশ্ন যখন হাতেম তা'য়ী শুনলেন তখন তিনি পথে বেরু লেন প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে। বহু মরু প্রান্ত র অতিক্রম করে হাতেম তা'য়ী একটি মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করেন। সেখানে একজন প্রবীণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসেন তার কাছে দশতে হাবেদার প্রবেশ-রহস্য জানতে পারেন। প্রবীণ ব্যক্তি নিয়ে যাবে। সেই পাতলপুরীতে আগন্ত ক লনেক আশ্চর্য দৃশ্য আর অনেক তন্বী সুন্দরীকে দেখতে পাবে। সবচেয়ে সুরূপা তরু ণীর হাত ধরলেই এক অদৃশ্য আঘাতে দশতে হাবেদায় নির্বাসিত হয়ে যাবে। দশতে হাবেদায় যাওয়ার এটাই সহজ পন্থা। এটা পুঁথির কাহিনী বটে। এর মধ্যে অলৌকিকতা এবং অস্বাভাবিকতা আছে সন্দেহ নেই। ফররু খ তার অনিন্দ্য সুন্দর ভাষায় এটাকে আধুনিক মনের কাছে গ্রাহ্য করেছে। তার প্রমাণ পাই ফররু খের বর্তমান বর্ণনায় :

একবার দেখে যার জিন্দেগীর সাধ মেটে নাই
দশতে হাবেদার মাঠে তুমি তার দেখা পাবে ভাই,
সে অজানা মাঠ থেকে ফেরে নাই কেউ এ যাবত;
যে গেছে ভুলেছে সেই মোহমুগ্ধ পৃথিবীর পথ।
তবুও তোমাকে বলি দূর দেশী এসেছো যখন,
আশ্চর্য রহস্যময় মানুষের প্রথম যৌবন,
সামর্থ্যের অধিকারী নেমে যেতে পারে সে সহজে

কামনার নিম্নাবর্তে পাশবিক প্রবৃত্তির ভোজে,
কিম্বা পারে উঠে যেতে উর্ধ্ব স্ত রে... উর্ধ্বে ফেরেশতার
সমস্ত সৃষ্টির মাঝে দীপ্ত যেন কুতুব তারার
রোশনি চির অমলিন। ইঙ্গিত জানায়ে বলি আজ
হাবেদার মাঠে শেষ হয় নাই মানুষের কাজ।

হুসনা বানুর দ্বিতীয় প্রশ্ন দৌলত পানিতে ফেলে নেকি কর - এ কথার কি রহস্য? এই সওয়ালের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সফরের পথে প্রথম তিনি হলুকা নামক একটি দৈত্যের সম্মুখীন হন। কৌশলে হলুকা দৈত্যকে হত্যা করে তিনি উৎপীড়িত জনতাকে রক্ষা করেন। খরযমের গোরস্থানে তিনি শহীদ ও বখিলের আত্মদর্শন করেন। দুর্গত বখিলের আত্মার অনুরোধে তাঁকে নতুন সফরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সম্পত্তি বন্টন শেষ হলে বখিলের আত্মা কবরের আযাব থেকে মুক্তিলাভ করে। অতঃপর হাতেম তা'য়ী নতুন সফর আরম্ভ করেন। সফরের পথে বেদাত শহরে উপস্থিত হলে জ্বীনের প্রভাবান্বিতা শাহাজাদী তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। হাতেম সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন। ইবলিশের অনুচর জ্বীনটিও হাতেমের অস্ত্রে নিহত হয়। পুঁথির ঘটনা এখানেই গড়িয়ে চলেছে। আরও অনেক সংশয় ও উপদ্রূপ অতিক্রম করে হাতেম তা'য়ী শেষ পর্যন্ত হুসনাবানুর দ্বিতীয় সওয়ালের জবাব পান। পুঁথিতে কাহিনী বিন্যাস এরকমই। ফররু খ আহমদ এই কাহিনীর মধ্যে চিন্ত া ও মানসলোকের পরিচর্যা এনেছে। ফররু খ এভাবে বর্ণনা দিয়েছেঃ

"দুসরা সওয়ালের পথে এই ভাবে চলে রাত্রি দিন, গ্রন্থি খুলে সমস্যার ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় হাতেম পৌঁছিল নগর প্রান্তে সম্পূর্ণ অচেনা; শুনিল সে লক্ষ সন্ত্রাসিত কণ্ঠে আর্তস্বর, আহাজারি করে। শুধালো হাতেম তা'য়ী যখন দেশের সমাচার বলিল প্রবীণ বৃদ্ধ, প্রাণী এক পাহাড় সমান হিংস্রতায় অতুলন পেরেশান করে প্রতিদিন ত্রস্ত জনপদ। আশ্চর্য রাক্ষস সেই মধ্যমুখ মরে না অস্ত্রের মুখে কিংবা হাতিয়ারে দুঃসাহসী জঙ্গী নৌজোয়ান যত মারা গেছে সম্মুখ সংগ্রামে রাক্ষসের হিংস্র নখে, ভয়ঙ্কর হিংস্র সে পিশাচ এ শহরে হানা দিয়ে তুলে নেয় প্রত্যহ শিকার আদম-সন্ত ান এক প্রতি দিন যায় তার মুখে।"

ফররু খ পুঁথির কল্পকাহিনীর ব্যতিক্রম ঘটায়নি। কিন্তু সেসব কল্পকাহিনী ভাষার সৌন্দর্যে এবং ছন্দের মাধুরিমায় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। পুঁথির শ্লথ ছন্দ-বিন্যাস এবং মিশ্রিত ভাষা-শৈলী আমাদের মনে চমক জাগায় না। আমরা আধুনিক সময়ে সে ভাষার আবেগে মুগ্ধ হই না। ফররু খের হাতে পুঁথির একটানা একঘেয়েমী একটি নতুন চাঞ্চল্যে আমাদের মনকে গ্রাস করে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ভাষা সব কিছুকে সজীব করে। একটি দুর্বল মক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষার চাতুর্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়। বাংলা ভাষাকে ফররু খ মার্জিত রু চির বাহন করেছে। নাগরিক সত্তা ফররু খের কবিতাকে অনুমোদন করে কিন্তু পুঁথিকে অনুমোদন করে

গ্রামীণ সত্তা। বাংলা ভাষাকে ফররু খ মর্জিত রু চির বাহন করেছে। গ্রামের লোকেরা অতীত থেকে জীবন দর্শন সন্ধান করে না, শুধুমাত্র অবাস্ত ব রহস্যের সন্ধান করে। পুঁথিতে তা ঘটতে থাকে। এটাই পুঁথির বৈশিষ্ট্য। পুঁথির সেই অবাস্ত ব অঙ্গীকারকে ফররু খ আহমদ ভাষার সাবলীলতা এবং ছন্দের চাতুর্য এবং বরাভয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে, যার ফলে আমরা অবাস্ত ব ঘটনার জন্য প্রশ্ন করিনা, কিন্তু মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মাঝে তাকে গ্রহণ করি। পুঁথির সময় ফুরিয়ে গেছে, সেজন্য আমরা আক্ষেপ করি না। বরঞ্চ বাংলা ভাষা-শৈলী নিরন্ত র নতুন সম্মোহ সৃষ্টি করছে। এটাতেই আমরা প্রীত।

ফররু খ আহমদ ইসলামের তত্ত্ব, জীবন সন্ধান এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তন্ন্যায়তা হাতেম তা'য়ীর চরিত্রে প্রকাশ করেছে। হাতেম তা'য়ী কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু ফররু খের হাতেম তা'য়ী একান্ত বাবে মুসলমান। ইসলামের ত্যাগ, সত্যের অন্বেষণ এগুলোর মধ্য দিয়ে হাতেম তা'য়ী একান্ত ভাবে মুসলমান। ইসলামের ত্যাগ, সত্যের অন্বেষণ এগুলোর মধ্য দিয়ে হাতেম তা'য়ী একজন ইসলামী ধ্যান-ধারণার জাগ্রত পুরু ষ। হাতেম তা'য়ীর চরিত্র্যে ফররু খ এইভাবে একটি দিক-দর্শন দেখাতে চেয়েছে। হাতেম তা'য়ী কাব্যের যে অংশটুকু আমরা উদ্ধৃত করি না কেন সেখানে ইসলামী সত্যবোধের চমৎকারিত্ব বিদ্যমান। এ পরিবর্তনটা কাব্যগত কারণে আমরা গ্রহণ করতে পারি। ফররু খের হাতেম একজন ন্যায়বান, নিষ্ঠাবান, সত্যসন্ধ এবং প্রজ্ঞাবান চিন্ত াশীল মুসলমান। তার ত্যাগের মধ্যে, কর্মের মধ্যে আল্লাহর ধ্যানের নিমগ্নতা আছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, 'সাত সাগরের মাঝি' এবং 'সিরাজাম মুনীরা' পেরিয়ে হাতেম তা'য়ী কাব্য অবিসংবাদিতভাবে ইসলামী আদর্শের একটি মহিমান্বিত রূপকে প্রকাশ করেছে।

হাতেম তা'য়ী ফররু খের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। ভাষার কৌশলে, শব্দের বিন্যাসে এবং ছন্দের গতিধারায় এই কাব্য বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রূপের কাব্য। এই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা ফররু খ বাংলা সাহিত্যে একটি চিরকালীন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে।

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, জুন, ২০০১]

ফররুখ আহমদের মুহূর্তের কবিতা

ফররু খ আহমদ সনেটের ভঙ্গিতে এবং চরণ-বিন্যাসে যে সমস্ত কবিতা লিখেছেন সেগুলো মুহূর্তের কবিতা বলে পরিচিত। মুহূর্তের কবিতা অর্থ যে কবিতা অল্প সময়ে পাঠ শেষ হয়। কিন্তু এর চেয়েও একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। সেটা হলো মুহূর্ত বলতে আমরা কি বুঝি, মুহূর্তের কোন পরিমাপ আছে কিনা এবং যা শাশ্বত এবং চিরকালই তাঁর সঙ্গে মুহূর্তের সম্পর্ক কী? মুহূর্ত বললে আমরা বুঝি একটি চলমান দ্রু ততা। সেটা স্থায়ী হয় না কিন্তু অল্প সময়ের জন্য তাঁর অস্তি ত্ব জানিয়ে যায়।

ফররু খ আহমদ মুহূর্তের কবিতার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, গতিমান মুহূর্তের খড়স্রোতের উদ্দাম। একই সঙ্গে ফররু খ বলেছেন যে, সময় হলো শাশ্বত এবং স্থির। এর অর্থ সময়ের কোন পরিমাণ নেই। কিন্তু আমরা আমাদের কর্তব্যকর্মে সময়কে হারাই। সে অর্থে সময় মুহূর্ত মাত্র। সুতরাং সময়ের দুটি পরিচয় আছে। একটি হল শাশ্বত পরিচয় আরেকটি হল খণ্ডকালীন মুহূর্তের পরিচয়। আমরা নিঃশ্বাস ফেলি এবং সে সঙ্গে সময়ও হারাই। মানুষের জীবন চেতনা এই নিঃশ্বাসও বর্ণের উপর নির্ভরশীল। আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলে চলি। অবশেষে আমাদের মৃত্যু হয়। ঐ নিঃশ্বাসগুলো জীবনের মুহূর্ত মাত্র। ফররু খ এটাকে বলেছেন "অধীর পাখির মত"। যে পাখি সমুদ্রের তীর দেখে এসে বিভিন্ন বর্ণ বিভায় পৃথিবীকে ভরে তোলে। ফররু খ আরো বলেছেন, যে জীবনের তপ্তশ্বাস এই মুহূর্তকে গণনা করে। এই যে, তপ্তশ্বাস এটি ফররু খের বিবেচনায় উচ্ছল সঙ্গীতের মতো। তিনি আরো বলেছেন মুহূর্তের কলতান বিশ্বের সুর সম্ভার পরিপূর্ণ করতে পারে না। তবে ক্ষণিকের কথার মূল্য আছে। আমরা পৃথিবী ছেড়ে যাবো, কিন্তু পৃথিবী থাকবে। অর্থাৎ আমাদের অস্তি ত্ব চঞ্চল আবার আমাদের অস্তি ত্ব চিরায়ত। মুহূর্তে আমরা সচল হই এবং মুহূর্তেই আমরা বিনাশপ্রাপ্ত হই। আমরা এই মুহূর্তে আছি। আবার শাশ্বত সময়-অঙ্গীকারেও আছি। এই কথাগুলো ফররু খ তাঁর মুহূর্তের কবিতায় বুঝাতে চেয়েছেন।

দীর্ঘ শতাব্দীর কথা মানুষ মনে রাখতে পারে না। যে জন্য আমরা যুগান্তে র কথা অথবা দীর্ঘ শতাব্দীর কথার খতিয়ান করতেও পারি না। আমাদের কাছে আছে শুধু ক্ষণকাল অর্থাৎ একটি মহূর্ত মাত্র। সেই মুহূর্তকে আমাদের জীবন্ত রাখতে হবে এবং সেই মুহূর্ত হচ্ছে উল্কার মতো নিক্ষিপ্ত একটি দ্রু তি। এই আসে এই চলে যায়। তাকে চিরকালের জন্য ধরে রাখা যায় না। আমরা একটি খণ্ডকালের মধ্যে বাস করি। সেখানেই আমাদের জীবন এবং সেখানেই আমাদের কর্ম-প্রবাহ। ফররু খ

একটি উদাহরণ দিয়েছেন, "ঘাসের সবুজ শিষে যেমন এক বিন্দু শিশির কণা" আমাদের জীবন ঠিক তেমনি। সে শিশির কণা সৌন্দর্যে অপরূপ কিন্তু তাঁর ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল আলো যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনি দীপ্তিমান, নক্ষত্রের দ্রু তি যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনি আমরা ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্যে বাস করি। শতাব্দী তৈরি হয় বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু সেটাও খেলাঘর। নিঃশব্দে সে খেলাঘর অতলে তলিয়ে যায়। আমরা যদি মুহূর্তের সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারি আমাদের চেতনায় তাহলে আমরা সার্থক হবো। শতাব্দীর চেতনার কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। চোখে যেমন দৃষ্টি আছে এবং সে দৃষ্টি সকল কিছুকে দেখে এবং আমাদের সকল মুহূর্ত স্পর্শ করে বেঁচে আছে। এইভাবে ফররু খ মুহূর্তকে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা মানুষ বিশেষ মুহূর্তের কথা চিন্ত া করি এবং বলি এমন একটি মহূর্ত আসুক যাকে আমরা আজীবন মনে রাখবো। সে বিশেষ মুহূর্ত কার জীবনে কখন আসে কেউ বলতে পারে না। ফররু খ বিষণ্ন সন্ত্রাসের কথা বলেছেন। বিষণ্ন সন্ত্রাসের দ্বারা কখনো বুঝাতে চেয়েছেন মানব জীবনের অস্থিরতা এবং লোভ। এই বিষণ্ন সন্ত্রাসকে তিনি দূর করতে বলেছেন। এবং আমদের জীবনে দুর্লভ মুহূর্ত হচ্ছে তাই যেটা বিষণ্নতা দূর করে এবং যে মুহূর্তের উজ্জ্বলতায় আমরা পদার্পণ করি। পুরনো যে দীপ্তি যাকে ফররু খ হারানো সঙ্গীতও বলেছেন, সেটা যখন মানুষের কর্ণে প্রবেশ করে তখন এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন মানুষের মধ্যে কবিতা রচনার প্রেরণা সৃষ্টি হয়, সেটা দুর্লভ মুহূর্তের একটি ঘটনা। কবিতা হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য। কবিতা থাকে সর্বত্র প্রতিদিনের পৃথিবীতে অরণ্যের সবুজাভায় এবং কবিতা থাকে অর্ধস্ফুট গোলাপের পাপড়িতে। এবং রাত্রিতে যখন শিশির পড়ে সেই শিশিরের ফোটায় কবিতার সৌন্দর্য জাগে। দুর্লভ মুহূর্ত হচ্ছে সেই মুহূর্ত যে মুহূর্তে মানুষ জীবনের সন্ধান পায় এবং রূপ লাবণ্যের স্পর্শ পায়। এইভাবে মুহূর্তকে আমরা জাগ্রত করি। প্রতিদিনের দৈন্য এবং হাহাকারের মধ্যে এই মহূর্ত আমাদের জীবনে বিষণ্নতা দূর করে। আমরা বহু বছর অপেক্ষা করে হঠাৎ এই মুহূর্তের তন্ময়তার সন্ধান পাই।

সুতরাং মহূর্তের সফলতা এবং সার্বিক উৎকর্ষ আমাদের পেতে হবে। আমাদের দিন যায়, রাত্রি শেষে প্রভাত আসে সেই প্রভাতের ঘাসের পাতায় আমরা শিশির বিন্দু দেখি এবং উল্লসিত হই। মুহূর্তে সেই শিশির বিন্দু রৌদ্রে শুকিয়ে যায়। কিন্তু আমি যে শিশির বিন্দু দেখলাম এটাইতো আমাদের সার্থকতা। মাটির বন্ধনে ঘাস থাকে সারা দিন তার মধ্যে রু ক্ষতা থাকে কিন্তু হঠাৎ সকালবেলা শিশিরের স্পর্শে সে পুলকিত হয়। আমাদের জীবনে সেই পুলকিত মুহূর্ত কখন আসবে আমরা তা বলতে পারি না। যখনই আসুক তখনই আমাদের মুগ্ধতা আসবে। এবং প্রাণচাঞ্চল্য জাগবে।

শাশ্বত আমরা কাকে বলি। সময়কে বলি? আমরা শাশ্বত বলি একমাত্র বিধাতাকে এবং তাঁর বাণীকে এবং তাঁর সৃষ্টির রহস্যকে। মাওলানা জালাল উদ্দীন

রু মী বলেছেন, সৃষ্টি ভঙ্গুর। এর কোন মূল্য নেই। একমাত্র বিধাতার অবস্থানই চিরকালীন। তিনি আরো বলেছেন সবই শূন্য এবং নিঃশেষ হবার যোগ্য। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা চিরকালীন। সুফীতত্ত্বের এই তাৎপর্যটা ফররু খ মুহূর্তের কবিতার মধ্যে আলোচনা করেন। তিনি শুধু মুহূর্তের শব্দটার ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা তাঁর "সাত সাগরের মাঝি" কবিতায় শাশ্বতের একটি ইঙ্গিত পেয়েছি। সেখানে তিনি বলেছেন উদ্দাম কল-কল্লোলের মধ্যে অসম্ভবকে অতিক্রম করে আমরা শাশ্বতের দরজায় গিয়ে পৌঁছাই। "সাত সাগরের মাঝি" কবিতার মধ্যে সে যাত্রা-পথের বর্ণনা আছে। মুহূর্তের কবিতায় এই তত্ত্বটি নেই, প্রয়োজনও নেই। তিনি দুই একবার শুধু সর্বকালিনতার কথা বলেছেন কিন্তু গুরু ত্বের সাথে ব্যাখ্যা করেননি। সুতরাং এ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না। এখানে চলমান মুহূর্তের কথাই আছে।

তবে এখানে কবিতাগুলো অত্যন্ত সুন্দর। প্রকৃতির কথা এসেছে, বৃষ্টির কথা এসেছে, বৈশাখের কথা এসেছে, ঝড়ের কথা এসেছে, এই প্রকৃতির কথাগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে এখানে এসেছে। 'বৃষ্টি' কবিতা অত্যন্ত সুন্দর। এই বৃষ্টিকে বলছেন বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। আমাদের কৃষি জীবনে এবং এক কথায় গ্রামীণ জীবনে এই বৃষ্টির প্রয়োজন বেশি। রৌদ্রদগ্ধ গ্রাম, বৃষ্টি পেয়ে সান্ত্বনা পায়। নদীর তীর আবাদী জমি যত আছে বৃষ্টি পেয়ে তা জীবন পায়। আর একটি কবিতার নাম 'বৈশাখী'। বৈশাখকে কবি রু ক্ষতার প্রতীক বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও বৈশাখকে রু দ্র বৈশাখ বলেছেন। ফররু খ বৃক্ষশূন্য মাঠ এবং রু ঢ়, রু ক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে বৈশাখের তুলনা করেছেন এবং বলেছেন, জীবন বৈশাখের সময় যেন স্পন্দনে জাগরিত হয়।

ফররু খ বিভিন্ন কবিতায় অশান্ত পৃথিবীর কথা বলেছেন। অশান্তি যে পৃথিবীর গতিকে কতভাবে ক্ষতি করছে একথা তিনি উচ্চারণ করেছেন এবং তিনি বলেছেন এই পৃথিবী শান্তি চায় এবং মানুষের প্রাণও শান্তি চায়। তার বক্তব্য হচ্ছে-

এ পৃথিবী শান্তি চায়, শান্তি চায় মানুষের প্রাণ,
সংশয়-সন্দেহ-দ্বন্দ্ব-অবিশ্বাস রক্তাক্ত বিক্ষত,
তারকালোকের পথে হয়তো সে চায় পরিত্রাণ;
মারণাস্ত্র গড়ে তবু মৃত্যু বয়ে আজ সে বিব্রত
জানি না কখন তার দুঃখ রাত্রি হবে অবসান
কণ্টকিত প্রশাখায় ফুটবে সে গোলাবের মতো।
('অশান্ড় পৃথিবী' ঃ মুহূর্তের কবিতা)

এখানে একটি কবিতার নাম - "হিংস্র ক্ষুদাতুর রাত্রি"। এতে কবি বলেছেন, রাত্রিতে পৃথিবীতে অনেক অন্যায় হয়, কে যেন রাত্রের অন্ধকারে সাপের বিষ ঢালে। মানুষ ক্ষণকালের জন্য যে বিশ্রাম এবং অবসর কামনা করবে তাও সে পারে না। এখানে ফররু খ রাতের পৃথিবীর অসহায়ত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য–

এক অন্ধকার যদি শেষ হয় তবে ঘনতর
রাত্রির তরঙ্গ মেঘ নেমে আসে প্রগাঢ় আঁধার
(সারা বুক চেপে ধরে জগদ্দল পাথরের মতো) ।
অথবা ছোবলে তার তনু মন করে সে আহত,
বিদ্যুৎ গতিতে তীব্র করে সে দংশন বারম্বার;
অজগর বেষ্টনীতে এ পৃথিবী কাঁপে থরোথরো ।
('হিংস্র, ক্ষুধাতুর রাত্রি' ঃ মুহূর্তের কবিতা)

ফররু খ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি সমস্ত অকল্যাণকে নিবারণ করেন, পৃথিবীর দৈন্যদশা দূর করেন এবং মানুষের চিত্তে প্রশান্তি এনে দেন। তিনি বলেছেন, বিধাতার প্রশ্রয় পেয়ে তিনি নিজে পূর্ণ কণ্ঠে গেয়ে যাবেন প্রভাতের গান। সে ভোর অথবা যে ভোর পৃথিবীর প্রতীক্ষার অপেক্ষায় আসবে সংশয়ের অন্ধকার ভেদ করে সে অন্ধকারের প্রতীক্ষায় তিনি রয়েছেন। তাই কবির শেষ কথা হচ্ছে যে, প্রভাত সকাল তিনি রঙের বৈচিত্র্য দিয়ে পৃথিবীটাকে সাজাবেন এবং মুহূর্তের আনন্দ উত্তাল উদ্ভাসিত করবে দিগ-দিগন্ত র ।

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৫ম সংখ্যা, জুন, ২০০২]

ফররুখ আহমদের 'দিলরুবা'

কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ 'মৃত্তিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'মৃত্তিকা'র স্বত্ত্বাধিকারীও ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের লেখার জন্য ফরমায়েস দিতেন। একবার তিনি আরব্য উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে আমাকে এবং ফররু খকে কবিতা লিখতে বলেছিলেন। আমি লিখেছিলাম "হাজার রাতের এক রাত" নামক একটি কবিতা। ফররু খ কোন কিছু লিখেছিলেন কিনা তা জানি না। 'মৃত্তিকার' পুরনো সংখ্যাগুলি পাওয়া গেলে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যেত। মোটকথা, আরব্য উপন্যাসের বিষয় অবলম্বন করে কিছু কবিতা লেখার প্রয়াস সেই সময় হয়েছিল। ফররু খের 'দিলরু বা' কাব্যগ্রন্থের সনেটগুচ্ছের মূল বিষয় প্রেম এবং তার মধ্যে আরব্য উপন্যাসের ইঙ্গিত আছে। আমার ধারণা ফররু খ কাজী আফসার উদ্দীনের অনুরোধ সেই সময় রক্ষা না করলেও আরব্য উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে "দিলরু বা" লিখেছিলেন। তাঁর জীবিত অবস্থায় এই কবিতাগুলো পুস্ত কাকারে ছাপা হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর আব্দুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় এই কবিতাগুলো প্রকাশিত হয়। এখানে আর একটি কথা বলা ভাল যে, বহুপূর্বে "দিলরু বার" একটি পাণ্ডুলিপি আমাকে ভুমিকা লেখার জন্য দিয়েছিল সবিহ-উল-আমিনের পক্ষ থেকে তার ভ্রাতা অথবা অন্য কেউ। আমি একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলাম কিন্তু ভূমিকাসহ এই পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। পরে আব্দুল মান্নান সৈয়দ "চট্টগ্রাম সংস্কৃতি" কেন্দ্রের পক্ষে "দিলরু বার" বইটি প্রকাশ করেন। আমার লেখা ভূমিকাসহ "দিলরু বা" প্রকাশ না পেলেও "দিলরু বা" যে আলোয় উপস্থিত হয়েছে সেই জন্য আমি আনন্দিত।

"দিলরু বা" প্রেমের কবিতা। কবিতাগুলো সনেটের আকারে লেখা। সনেটে পরম্পরা থাকে বলে এইগুলো সে রকম নয়। ইংরেজীতে সনেট সিকোয়েন্স বা পরম্পরা অনেক আছে যেমন- "এলিজাবেথ ব্রাউনিং"। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে "সেক্সপীয়ারের" সনেট পরম্পরা। তিনি একজন মহিলাকে লক্ষ্য করে তাঁর সনেটগুলো লিখেছিলেন। এই সনেটগুলো বিশ্বসাহিত্যে অসাধারণ। ভাবের গভীরতায়, আবেগের উচ্ছলতায় এবং প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসের উন্মাদনায় এগুলোর তুলনা নেই। তিনি প্রতিটি সনেটের মধ্যে একজন নারীর প্রতি তার ভালবাসা এবং অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন। "সেক্সপীয়ারের" এই সনেট পরম্পরা পাঠ করলে মনে হয় এ

যেন একটি প্রেম কাহিনী। একটি সনেটের মাঝে পরবর্তী সনেটের সম্পর্ক আছে এবং সব কয়টি সনেট মিলে একটি ভালবাসার দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। এলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর সনেটগুলো কোমল এবং আতিশর্যে পরিপূর্ণ। সেক্সপীয়ারের মতো উদ্দীপনাপূর্ণ না হলেও এই সনেটগুলো প্রেমের প্রশান্তি বহন করে। বাংলায় সনেট পরিপূর্ণতার দ্যোতনা সৃষ্টি করে না। এটার কারণ বোধ হয় সনেট বাংলা ভাষার নিজস্ব বিষয় নয়। সনেটের প্রকৃতি যে রকম সে রকম প্রকৃতি বাংলা কবিতায় কখনও ছিল না। প্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর সনেটগুলোকে সনেট বলেননি, "চতুর্দশপদী" কবিতা বলেছেন। এগুলোর প্রতিটি কবিতা অন্য কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ প্রতিটি সনেট স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্যারিসের ভার্সেই শহরে প্রবাস-জীবন যাপন করবার সময় কবির বাংলাদেশের কথা মনে হয়েছে অথবা বলতে পারি তাঁর মাতৃভূমির কথা মনে হয়েছে এবং তিনি স্মরণ করেছেন তাঁর দেশের নদীকে, বটবৃক্ষকে এবং প্রাচীন কাব্যকে। এগুলো স্মরণের মধ্য দিয়ে তাঁর "চতুর্দশপদী" কবিতাগুলি মনোমুগ্ধকর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও সনেট লিখেছেন, মোহিতলাল মজুমদারেরও সনেট আছে এবং এখনকার দিনেও অনেকেই সনেট লিখছেন কিন্তু সনেট রচনার ক্ষেত্রে আমরা সত্যিকারের দক্ষতা দেখাতে পারিনি।

'ফররু খের' সনেট অনেক আছে। "দিলরু বার" সনেটগুলো তার একটি পর্যায়। এ গ্রন্থের একটি সনেট অন্য সনেটের সংলগ্ন নয়। অর্থাৎ আমরা যাকে সনেট পরম্পরা বলি এগুলো তা নয়। আমি প্রথমেই বলেছি এ সনেটগুলো আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর রসাবেশ নিয়ে লেখা। এথম সনেটটিতে "হাজার রাতের কথা" উল্লেখ আছে। এ সনেটটি নিচে উদ্ধৃত হলো :

হাজার রাত্রির কোন এক রাতে যদি ভুলে থাকি
প্রতিজ্ঞা আমরা, কিম্বা অসতর্ক যদি ভুলে থাকো
তোমার প্রতিজ্ঞা- তবে সঙ্কল্পের দোষ দিয়ো নাকো;
সে রাত্রির- তীরে এসে বহুদূরে গিয়েছিল ডাকি,
আকাশের বাঁকা রেখা (স্বপ্নাচ্ছন্ন চাঁদ কিম্বা পাখী)
সমুদ্রে অথবা মনে এনেছিল দুরন্ত জোয়ার।
সংশয়ের দাহ মুছে, ভেঙ্গে দিয়ে গ্রন্থি এ মিথ্যার
মুহূর্তের মূর্ছনায় তনু মন ফেলেছিল ঢাকি।
সৃষ্টি-সম্ভাবনা-দীপ্ত সে নিশীথে প্রোজ্জ্বল উৎসাহে
প্রেম এসেছিল কাছে, শতাব্দীর যে বন্ধ্যা মৃত্তিকা
জ্বলিয়াছে এতকাল তৃষিত মনের অন্ত ঃর্দাহে
সে-ও চেয়েছিল তার মৃত স্বপ্নে তারকার শিখা'
আ-দিগন্ত জীবনের স্বপ্নলুব্ধ সুপ্ত নীহারিকা
নিজেরে বিলায়ে দিতে চেয়েছিল উত্তাল প্রবাহে।

এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে, ফররু খ "পুঁথি সাহিত্য" গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি "হাতেম তায়ী", "কাসাসুল আম্বিয়া" এবং "আলিফ লায়লার" পুঁথি সব সময় সঙ্গে রাখতেন। "হাতেম তায়ীর" পুঁথি অবলম্বন করে তিনি "হাতেম তা'য়ী" কাব্য লিখেছেন পুঁথির বর্ণনাভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে তিনি নিজের মেজাজে আধুনিক শিল্প-সৌন্দর্য্যে "হাতেম তায়ী" লিখেছেন কিন্তু উৎসকে তিনি কোন দিন ভোলেন নি। "আলিফ লায়লার" পুঁথির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে প্রেম। সেই প্রেমের ক্ষেত্রে নর-নারীর যে মানসিক অস্থিরতা তা সেখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আরব্য উপন্যাসে প্রেম ভঙ্গের ইতিহাস আছে এবং প্রেমাস্পদ নারী-পুরু ষের কথা আছে। মূলতঃ বিশ্বসাহিত্যের এই বিখ্যাত গ্রন্থটির প্রধান চরিত্রটি হচ্ছে "নারী"। এভাবে নারীকে লক্ষ্য করে ফররু খের "দিলরু বা" কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলো গ্রথিত। এখানে আরব্য উপন্যাসের কোন কাহিনী নেই অথবা বিশেষ কোন চরিত্রের অভিব্যক্তি নেই। শুধুমাত্র প্রেমের যে রসাবেশ তাঁকে অবলম্বন করে এবং তা দিয়ে তিনি "দিলরু বার" সনেটগুলো সাজিয়েছেন।

ফররু খ যে আরব্য উপন্যাসের প্রেমকে অবলম্বন করে এই কাব্য রচনা করেছেন তার সাক্ষী আমি নিজে। কলকাতায় থাকতে আমরা প্রায়ই একে অন্যের সান্নিধ্যে আসতাম। আমার সান্নিধ্য-সূত্র তৈরী করে দিত কখন কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ, কখনও সিকান্দার আবু জাফর। 'মৃত্তিকা'র অফিসে আমরা কখনও মিলিত হতাম অথবা কখনও সিকান্দারের সার্কাস এভিনিউ বাসায় আসর বসত, কখনওবা আমার মেসে। আমি থাকতাম গার্ডনার লেনে। এখানেও ফররু খের নিত্য গতিবিধি ছিল। সুতরাং ফররু খ সম্পর্কে আমি যতটা সুনিশ্চিত হয়ে কথা বলতে পারি ততটা বোধ হয় আর কেউ বলতে পারবে না। ফররু খের বন্ধুদের মধ্যে এবং ফররু খের নিজস্ব গণ্ডির লোকদের মধ্যে এখন আর কেউ বর্তমান নেই। দুই একজন যারা আছেন তারা গভীরভাবে ফররু খকে জানতেন না। যেমন আবু রু শদ অথবা আবুল হোসেন। তাদের সঙ্গে কোলকাতার জীবনে কখনও কখনও ফররু খের দেখা হতো। কিন্তু সেটাকে গভীর অন্ত রঙ্গতা বলা চলে না। ফররু খের কোলকাতার জীবন এবং ঢাকার জীবন এ দু'য়ের সাক্ষী আমি। সুতরাং আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি ফররু খের মূল্যায়ন করছি। সেই অভিজ্ঞতা সূত্রে আমি বলছি যে, "দিলরু বার" সনেটগুলো আরব্য উপন্যাসের প্রেক্ষিতে রচিত। প্রেক্ষিত বলতে আরব্য উপন্যাসের ঘটনা বুঝাতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আরব্য উপন্যাসের নারী ঘটিত ইচ্ছা ও অনিচ্ছার কথা বলছি না।

ফররু খ আহমদ তাঁর "দিলরু বার" সনেটগুলোকে সাতটি স্ত বকে বিভক্ত করেছেন। কেন করেছেন তা ঠিক স্পষ্ট নয়। কেননা সব কবিতায় একই অশরীরী প্রেমের গুঞ্জরণ। একটি স্ত বকে একটি বিশেষ ভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। এভাবে স্ত বক বিভাগ না থাকলেও চলতো। কেননা প্রেমের অর্থাৎ প্রেমজনিত আত্মিক উপলব্ধির বিশ্লেষণ সব কবিতায় আছে। স্ত বকগত বিভাগে কবিতাগুলোর বিশেষ

বৈশিষ্ট্য যে ফুটে উঠেছে, তা নয়। আমার মনে হয়, কবি একটি স্ত বকের সঙ্গে অন্য স্ত বকের সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য বিবেচনা করতে চেয়েছিলেন। প্রথম স্ত বকের কবিতাগুলো আমরা বলতে পারি প্রস্ত াবনামূলক। সেখানে ছয়টি সনেট আছে। প্রথম সনেটে "হাজার রাতের" কোন এক রাতের কথা আছে। দ্বিতীয় সনেটে স্বপ্নের কথা আছে যে স্বপ্ন কবি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তৃতীয় সনেটে "মৌসুমী ফুলের" দিন শেষ হলো এবং মৃত্যুর অভিনিবেশ এনেছেন একথা তিনি বলেছেন। চতুর্থ সনেটে 'বিভ্রান্ত সন্ধ্যার চক্রে'র কথা বলেছেন। পঞ্চম সনেটে "কাল বৈশাখী" বেশে প্রিয়াকে আহ্বান করেছেন এবং ৬ষ্ঠ সনেটে প্রিয়াকে নিকটে আহ্বান করেছেন। বলা যেতে পারে, এখানকার অর্থাৎ প্রথম স্ত বকের সনেটগুলো প্রেমের প্রস্ত াবনার মতো। কি কি কারণে প্রেমের প্রস্ত াবনা করেছেন সে কারণগুলো এই সনেটগুলোতে তিনি বর্ণনা করেছেন। জানিনা আমি ঠিক বললাম কি না? কেননা প্রতিটি সনেটেই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রেমের প্রথম উন্মেষের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্ত বকে প্রেমিকার যে চিত্র কবির হৃদয়ে জেগে উঠেছে সেই চিত্রের বিষয়ে কবি কথা বলেছেন। এখানে প্রথম সনেটে প্রেমিকার যে চিত্র কবির হৃদয়ে জেগে উঠেছে সে চিত্রের বিষয় নিয়ে কবি কথা বলেছেন। দ্বিতীয় সনেটে প্রেমিকার প্রতি আকর্ষণকে কবি এক অতৃপ্ত কামনা বলেছেন। তৃতীয় সনেটেও সেই রকম অতৃপ্ত তৃষ্ণার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ সনেটে অজ্ঞাত সংশয়ের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম সনেটে সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে প্রেমিকাকে সুন্দর ভেবেছেন কবি। ৬ষ্ঠ সনেটে প্রেমের প্রথম আবির্ভাবের কথা বলা আছে এবং সপ্তম সনেটে সব কিছু অতিক্রম করে প্রেম যে যুগে যুগে বেঁচে থাকে সে কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় স্ত বকে কবি নিজের কথা বলেছেন। অর্থাৎ নিজের বিশ্বাসের কথা এবং নিজের প্রতীক্ষার কথা। প্রথম সনেটে তিনি প্রতীক্ষায় রয়েছেন একথা বলেছেন। দ্বিতীয় সনেটে তিনি প্রেমিকাকে বলতে চাননি যে, তিনি কাকে ভালবাসেন। তৃতীয় সনেটে শিশির আর্দ্র রাতে প্রভাতের আকাশ যেমন প্রতিভাত হয় না তেমনি প্রেমও সেভাবে প্রতিভাত হয় না একথা বলেছেন। চতুর্থ সনেটে যে প্রেমে বেদনার দাহ নেই সেই প্রেম প্রেম নয় একথা বলেছেন। পঞ্চম সনেটে বলা হয়েছে যে, হৃদয়ের সব অনুভূতি মুছে ফেলতে চান কেননা তার বিক্ষত মন শুধু প্রেমিকাকে চেয়েছিল। ষষ্ঠ সনেটে শব্দ মুখরিত দিন এবং স্ত ব্ধ রাতে আবেশের কথা বলেছেন। এবং সপ্তম সনেটে তিনি প্রেমিকাকে ভালবেসে সমস্ত পৃথিবীটাকে ভালবেসেছেন।

চতুর্থ স্ত বকে মোট পাঁচটি সনেট আছে। এই সনেটগুলোতে মূলতঃ প্রেমিকার প্রসঙ্গে কবির অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমিকের অনুভূতি বুঝতে পেরে সেকথা কবি বলেছেন এবং বুঝতে না পারার দরু ণ কবির হৃদয়ে যে আঘাত লেগেছে সেই আঘাতের কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু অবশেষে কবির সান্ত্রনা হচ্ছে এই ভেবে যে, প্রেমিকা মুখে যে কথা বলেনি সেই কথা তার আঁখি দুটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে।

পঞ্চম স্ত বকে ৬টি সনেট আছে। সব কয়টি স নেটে কবি প্রেমিকার কাছে আর্জি জানাচ্ছেন এবং এখানে কিছুটা রমণীয় শরীরের আবেশ এসেছে। কিন্তু সেগুলো শরীরী তাপ অথবা কোন প্রকার শরীরী আশ্লেষ নয়। শরীরের ক্ষেত্রে প্রায় নীতিবাচক যেমন গ্রীবা-ভঙ্গের কথা তিনি বলেছেন। এতে বিশেষ রমণীর গ্রীবা বুঝা যাচ্ছে না। এটা একটি প্রথাগত কথা। যেমন সংস্কৃত কাব্যে আছে "মরাল গ্রীবা"। এখানকার প্রথম সনেটে কবি প্রেমিকাকে বিচিত্র বলেছেন। বলেছেন তার দৃষ্টিতে মুখরতা এবং গ্রীবা-ভঙ্গে রহস্য রয়েছে। দ্বিতীয় সনেটেও গ্রীবা-ভঙ্গ এবং পদ্মপ্রভ মুখের কথা এসেছে। কোনটাই বিশিষ্ট নয়। ইচ্ছে করলেই একজন কবি সকল রমণীর ক্ষেত্রেই এইগুলো প্রয়োগ করতে পারেন। তৃতীয় সনেটে স্বপ্নের কথা বলেছেন। কবি স্বপ্ন দেখছেন ঘুমে এবং জাগরণে। অর্থাৎ প্রেম যেন নিদ্রায় এবং জাগরণে একই রকম। চতুর্থ সনেটে আবার স্বপ্নের কথা এসেছে। যে স্বপ্ন প্রকাশ পাচ্ছে দৃষ্টির সংকেতে। পঞ্চম সনেটে রমণীর ক্ষণকালীন অদর্শনের কথা তিনি বলেছেন। ষষ্ঠ সনেটে কবি প্রেমের ক্ষেত্রে তপ্ত কথা শুনতে ইচ্ছুক নন এ রকম একটি আবেশ আছে।

ষষ্ঠ স্ত বকে সাতটি সনেট আমরা পাই। এখানে কবির নিজের কথাই সর্বস্ব। জীবনের জটিল গ্রন্থিকে আরো জটিল করা হয় যদি চিন্ত া করা হয়। দ্বিতীয় সনেটে তিনি নিজেকে সূর্যসম বলেছেন যে সূর্য তীব্র আলোক ছড়ায়। তৃতীয় সনেটে রাত্রির তারার রহস্যের কথা আছে। চতুর্থ সনেটেও সেই তারার ঔজ্বলোর কথা আছে। পঞ্চম সনেটে তিনি রমণীর পথের উপর তার হৃদয় রেখেছেন একথা বলেছেন। ৬ষ্ঠ সনেটে গোলাপের রক্তিম অধরের কথা আছে। সপ্তম সনেটে প্রেমের রহস্যের যে অন্ত নেই সেকথা বলেছেন।

সপ্তম স্ত বক এই গ্রন্থের শেষ স্ত বক। এখানে সনেটগুলোতে প্রেম নামক একটি অনুভূতির সন্ধানে কবি যে সর্বক্ষণ ঘুরে ফিরছেন সে কথা আছে। এখানেই মনে হয় কবি কিছুটা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি আদৌ কোন শরীরী রমণীকে ভালবাসেননি। তিনি ভালবাসাকে-ভালবেসেছেন। মাওলানা রু মী যে কথা তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন যে, আমি ভালবাসাকে ভালেবেসে তার সান্নিধ্যে যেতে চাই। অর্থাৎ তাঁর ভালবাসা কোন নারী-কেন্দ্রিক নয়। ফররু খও এই স্ত বকের কবিতাগুলোতে এটা বলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রেম রহস্যময় এবং তাঁর প্রেম "অলৌকিক মুগ্ধতা"। একটি সনেটে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে চিরন্ত ন সত্তা থেকে সত্যিকার প্রেম বিচ্ছুরিত হয়। তিনি বলেছেন প্রেম হল একটি পাথেয়। সেই পাথেয় নিয়ে একজন ভক্ত উর্ধ্বে নীহারিকালোকে যাত্রা করে। এই শেষের কবিতাটি "দিলরু বা" কবিতাগুলোর মূলতত্ত্ব বহন করছে বলে মনে হয়। কবিতাটি এই :

সে পাথেয় নিয়ে চলে ভাবনায় নীহারিকালোকে
ভ্রাম্যমান মন মোর- সহযাত্রী তার লক্ষ তারকার,

অস্ফুট গোধূলি থেকে অগণন তারার ঝলকে
বিস্ময়ের অধিত্যকা পার হয়ে পাখা মেলে তার
নতুন বিস্ময় পানে। জীবনের সৌর দিগ্বলয়ে
আলোর পাপড়ি যত খুলে যায় তত অজানায়
দূরত্ব বাড়িয়ে চলে। চলি আমি অজ্ঞাত বিস্ময়ে
প্রিয়ার মঞ্জিল পানে আলো নিয়ে অশেষ চেতনায়।
পরিপূর্ণ-রূপে তাই তোমাকে যে হয় নাই জানা
তাতে মোর নাই ক্ষোভ, শুধু আমি আশা ক'রে আছি
যে মধু পিপাসু চিত্র একদিন মেলিয়াছে ডানা
তোমার রাত্রির স্বপ্নে ঠাঁই পাবে কভু সে মৌমাছি
জাগ্রত চেতনা আছে অথবা বিশ্রান্ত ঘুম ঘোরে
আত্মার স্মরণালোকে-প্রেমের প্রোজ্জ্বল স্মৃতি ডোরে।

ফররু খের প্রেমের কবিতায় 'প্রেম' যে একটি অনিবার্য সত্তা তা বলা হয়েছে। শাশ্বত 'প্রেম' যাকে বলে অর্থাৎ যে প্রেম লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদের প্রতীকে প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রেমকে ফররু খ নিজের উপজীব্য করেছেন। এই প্রেমের কবিতাগুলোতে রিরিংসার রসাবেশ নেই এবং কোন বিশেস প্রেমিকাও নেই। প্রেমকে কবি একটি অন্ত রঙ্গ রসাবেশে পরিণত করেছেন। তাই একে বলা যায় প্রেম, শাশ্বত প্রেম। যার আদি নেই এবং অন্ত নেই। ফররু খ মৌলিকভাবে কখনও কোন রমণী বন্দনা করেননি কিন্তু প্রেমের রসাবেশ এনেছেন। এখানেই তার বিশিষ্টতা।

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০১]

সৈয়দ আলী আহসান

[সংক্ষিপ্ত পরিচিতি]

বিশিষ্ট কবি, সাহিত্য-সমালোচক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, বক্তা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম– ২৬ মার্চ ১৯২০, মৃত্যু– ২৫ জুলাই ২০০২) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মনন-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সৈয়দ আলী আহসান কবি হিসাবে সমধিক খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর অবদানে আমাদের সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ, সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানা দিক ও বিভাগও তেমনি ঋদ্ধ ও সমুন্নত হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে স্বদেশে তিনি যেমন একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে সম্মানিত ছিলেন, আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি ছিলেন বিশেষভাবে সমাদৃত।

সৈয়দ আলী আহসান মাগুরা জেলার অন্ত র্গত আলোকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আল হামেদ। ১৯৩৭ সালে আরমানিটোলা সরকারি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক, ১৯৩৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. পাশ করে ঢাকাস্থ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন ও ১৯৪৫ সনের শেষের দিকে কলকাতা রেডিওতে প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট হিসাবে চাকরি নেন। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের পর তিনি ঢাকা রেডিওতে যোগদান করেন। এরপর ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। এরপর ১৯৫৩ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রীডার ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগ দেন, ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক (তখনও

মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি হয়নি) পদে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং প্রফেসর হিসাবে যোগ দেন এবং সেখান থেকেই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কলকাতা চলে যান এবং 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' নিয়মিত অনুষ্ঠান করা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠনে গুরু ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধকালে আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে গুরু ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে তিনি মূল্যবান অবদান রাখেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পূর্ব পদে যোগদান করেন। পরে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, অতঃপর ১৯৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন) এবং ১৯৭৮ সালে পুনরায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইন্তি কালের পূর্বে তিনি কিছুকাল দারু ল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আন্ত র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ও কবি ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ প্রতিষ্ঠিত দারু ল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, ইউনেস্কোর উপদেষ্টা, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসাবে বিভিন্ন গুরু ত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে দেশীয় ও আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রে বহু গুরু ত্বপূর্ণ পদ ও দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে আয়োজিত বহু আন্ত র্জাতিক সভা-সেমিনারে যোগদান উপলক্ষ্যে বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি মোট প্রায় ৭/৮টি ভাষা জানতেন। বাংলা ছাড়া ইংরাজি ভাষায়ও তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও অসংখ্য নিবন্ধ রচনা করেন। বিশাল বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী সৈয়দ আলী আহসান মোট ১০৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা ঃ

গবেষণামূলক গ্রন্থ :

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সাথে যুগ্মভাবে ১৯৫৪)
২. নজরু ল ইসলাম (১৯৫৪)
৩. Essays in Bengali Literature (১৯৫৬)
৪. কবি মধুসূদন (১৯৫৭)
৫. কবিতার কথা (১৯৫৭)
১. সাহিত্যের কথা (১৯৬৪)
২. কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (১৯৬৮)
৩. পদ্মাবতী (১৯৬৮)

৪. মধুমালতী (১৯৭২)
৫. আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০)
৬. রবীন্দ্রনাথ ঃ কাব্য বিচারের ভূমিকা (১৯৭৪)
৭. মধুসূদন ঃ কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ (১৯৭৫)
৮. আধুনিক জার্মান সাহিত্য (১৯৭৬)
৯. সতত স্বগত (১৯৮৩)
১০. শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য (১৯৮৩)
১১. সরহপার দোহাকোষ গীতি (১৯৯৩)
১২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ (১৯৯৪)
১৩. আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ (১৯৯৬)
১৪. মৃগাবতী (১৯৯৮)।

গল্প :

১. গল্পসংগ্রহ (১৯৫২)
২. গল্প সংকলন (১৯৬৯)।

আত্ম-জৈবনিক উপন্যাস :

১. জিন্দাবাহারের গলি (১৯৮৫)
২. স্রোতোবাহী নদী (১৯৮৯)।

কবিতা :

১. অনেক আকাশ (১৯৫৯)
২. একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪)
৩. সহসা সচকিত (১৯৬৫)
৪. উচ্চারণ (১৯৬৮)
৫. আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৪)
৬. কাব্য সমগ্র (১৯৭৪)
৭. চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৮৫)
৮. সমুদ্রেই যাব (১৯৮৭)
৯. রজনীগন্ধা (১৯৮৮)
১০. নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৬)।

শিশুতোষ : কখনো আকাশ (১৯৮৪)।

ভ্রমণকাহিনী :

১. প্রেম যেখানে সর্বস্ব (১৯৮৭)
২. হে প্রভু আমি উপস্থিত।

আত্মজীবনী : আমার সাক্ষ্য (১৯৯৪)।

অনুবাদ :

১. ইকবালের কবিতা (১৯৫২)
২. প্রেমের কবিতা (যুগ্মভাবে ১৯৫৮)
৩. হুইটম্যানের কবিতা (১৯৬৫)
৪. ইডিপাস (১৯৬৮)
৫. সাম্প্রতিক জার্মান গল্প (১৯৭০)
৬. জার্মান সাহিত্য একটি নিদর্শনী (১৯৭৪)
৭. উইলিয়াম মেরিডিথের নির্বাচিত কবিতা (১৯৮২)
৮. সন্দেশ রাসক (১৯৮৭)
৯. নাহ্‌জুল বালাঘা (১৯৮৮) ।

সম্পাদনা :

১. রূপচ্ছন্দা (যৌথ ১৯৫০)
২. আধুনিক গদ্য সংগ্রহ (গল্প সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ১৯৫৩)
৩. গল্প সঞ্চায়ন (যৌথভাবে, ১৯৫৪)
৪. লোক সাহিত্য (১ম খণ্ড, ১৯৬৬)
৫. বীরাঙ্গনা কাব্য ঃ মধুসূদন (১৯৬৮)
৬. মেধনাদবধ কাব্য ঃ মধুসূদন (১৯৬৮)
৭. একেই বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৯৬৮)
৮. বাংলাদেশ (১৯৭২)
৯. চর্যাগীতি (১৯৮৪)

ধর্মবিষয়ক :

১. মহানবী (১৯৯৫)
২. শাহ আলী বোগদাদী (১৯৯৫)
৩. আলাহ্‌র অস্তিত্ব (১৯৯৫)

এছাড়াও রয়েছে তাঁর অপ্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান রচনাবলি। সৈয়দ আলী আহসান বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসাধারণ অবদান ও কৃতিত্বের জন্য দেশীয় ও আন্ত র্জাতিক বিভিন্ন স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৮, প্রত্যাখ্যান), সুফী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক (১৯৬৭), একুশে পদক(১৯৮৩), নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮৫), মধুসূদন পুরস্কার (১৯৮৫), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৮), Officer Del Orore Des Arts Et Des Letters, Paris (১৯৯২), হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৭৪ সালে নাগপুর বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত সম্মাননা পত্র। 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ পদক - ১৯৯১', 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ স্বর্ণপদক' (১৯৯৮) প্রভৃতি লাভ করেন।♦

ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশনের কয়েকটি মূল্যবান প্রকাশনা

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ রচিত

বাংলা কাব্যে ফররুখ আহ্‌মদ ঃ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ রচিত উপমাশোভিত ফররুখ

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

কবি ফররুখ আহ্‌মদের কাব্যগ্রন্থ সিরাজাম মুনীরা

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

The English Translation of Some Selected Poems of
Farrukh Ahmad (Enlarged Second Edition)
by Abdur Rashid Khan Price: 100.00 Taka.

মুহম্মদ মতিউর রহমান রচিত 'ফররুখ প্রতিভা' (৩য় সংস্করণ)

মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

মুহম্মদ মতিউর রহমান রচিত

কবি ফররুখ আহমদঃ জীবন ও সাহিত্যবিষয়ক তথ্যপঞ্জী

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

সৈয়দ আলী আহসান রচিত

ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্য

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

মুহম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত

ফররুখ সাহিত্য বিচার

মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

ফররুখ একাডেমী পত্রিকা

কবি ফররু খ আহমদ বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা (প্রতি সংখ্যা)

পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৮১৯৪২০৪৮৯, ০১৭১৫৭৫২০১৯১